শিক্ষায় ক্রম-বিকাশ

শ্রীমোহিতকুমার সেনগুপ্ত

শিক্ষায় ক্রম-বিকাশ

শ্রীমোহিতকুমার সেনগুপ্ত
এম. এ., বি. টি., ডবলিউ. বি. ই. এস.

জিলা বিদ্যালয় পরিদর্শক, পশ্চিমবঙ্গ

ভারতী বুক স্টল
প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা
৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

নূতন সংস্করণ

৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯, ভারতী বুক স্টলের পক্ষ হইতে
শ্রীহৃষীকেশ বারিক কর্তৃক প্রকাশিত ও ৩১, বাদুড় বাগান
স্ট্রীট, কলিকাতা-৯, রূপবাণী প্রেসের পক্ষ হইতে
শ্রীভোলানাথ হাজরা কর্তৃক মুদ্রিত।

ভূমিকা

১৭৫৭ সালে পলাশী-প্রান্তরে বাংলার দরদী নবাবকে পরাজিত করিয়া ইংরাজেরা প্রকৃতপক্ষে এই দেশের শাসন-ভার গ্রহণ করেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি (East India Company) ভারতবর্ষে আসিয়াছিল ব্যবসায় করিতে ; কিন্তু রাজ্যভার যখন তাহাদের হাতে আসিল, তখনও তাহাদের বণিক প্রবৃত্তিই বড় করিয়া দেখা দিল। ব্যবসায়-বাণিজ্যের পথ সুগম করা এবং রাজস্ব আদায় করাই ছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির লক্ষ্য। যে দেশের শাসন-ভার তাহাদের উপর অর্পিত হইল, সেই দেশবাসীর শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করা বা জীবনের মান উন্নয়ন করার দিকে নূতন শাসকদের বিশেষ চেষ্টা দেখা গেল না।

ইংরাজ-শাসনের পূর্বে বাংলা দেশে যে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না, তাহা নহে। তবে শিক্ষার কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল বলিয়া মনে হয় না। প্রায় সকল গ্রামেই ঠাকুরের নাট-মন্দিরে বা মসজিদে পাঠশালা বসিত। গ্রাম্য পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট মাতৃভাষা, গণিত, হিসাব ইত্যাদি শিখিয়া অধিকাংশ দেশবাসী জীবিকা অর্জনের কাজে লাগিয়া যাইত। যাহাদের উচ্চ শিক্ষার আগ্রহ ছিল তাহারা টোল বা মাদ্রাসাতে সংস্কৃত, আরবী ও পারসী শিক্ষা করিত। মুসলমান আমলে পারসী ভাষার সাহায্যে শাসনকার্য চলিত বলিয়া হিন্দু; মুসলমান অনেকেই পারসী ভাষা শিখিতেন।

ইংরাজ-শাসনের সঙ্গে সঙ্গে এই দেশে খ্রীষ্টান ধর্মযাজকদের আবির্ভাব হইল। ধর্ম-প্রচার ও শিক্ষা-বিস্তারই এই ধর্মযাজকদের লক্ষ্য ছিল। শ্রীরামপুরের ধর্মযাজকেরা হুগলী জেলায় কতকগুলি উন্নত ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। হেয়ার সাহেবের নেতৃত্বে কলিকাতায় School Book Society কর্তৃক কতকগুলি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

১৮১১ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সর্বপ্রথম এই দেশে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য এক লক্ষ টাকা মঞ্জুর করে। তখন আবার প্রশ্ন উঠে, এই টাকা সংস্কৃত, আরবী, পারসী প্রভৃতি প্রাচ্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তারের জন্য ব্যয়িত হইবে কিংবা ইংরাজী শিক্ষা-বিস্তারের জন্য ব্যয়িত হইবে। কয়েক বৎসর বাদানুবাদের পর মেকলে সাহেব তাঁহার নির্দেশনামাতে ইংরাজী শিক্ষার অনুকূলে রায় দিয়া এই তর্কের যবনিকাপাত করেন।

১৮১৪ সালে চুঁচুড়াতে মে সাহেব সর্বপ্রথম একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই দেশে ইংরাজী শিক্ষা-বিস্তারের ইতিহাসে ইহা একটি স্মরণীয় ঘটনা। তারপর ১৮১৭ সালে হেয়ার সাহেবের উদ্যোগে কলিকাতায় একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ইহাই পরে হিন্দু কলেজে উন্নীত হয়। তাহার পর হইতে একটি দুইটি করিয়া ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতি বৎসরই স্থাপিত হইতে থাকে। ইংরাজী শিক্ষা-বিস্তারের জন্য সরকারী সাহায্যও ক্রমশঃ আসিতে লাগিল।

সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতের শাসন-ব্যবস্থা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাত হইতে ইংলণ্ডের রানী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে গ্রহণ করেন। অতঃপর এই দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করিবার জন্য বিভিন্ন সময়ে কয়েকটি কমিশন ও কমিটি নিযুক্ত হন।

এই সকল কমিশন ও কমিটি শিক্ষা সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে কি কি সুপারিশ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সুপারিশ অনুসারে কতটা কাজ হইয়াছে, এই পুস্তকে তাহাই আলোচিত হইয়াছে। বিভিন্ন কমিশন ও কমিটির রিপোর্ট সব সময় সকল শিক্ষার্থীর হাতে সহজে আসে না। ঐ সুপারিশগুলির মোটামুটি একটা ধারণা এই পুস্তকে শিক্ষার্থী পাইতে পারিবেন, এই আশা লইয়াই পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। উদ্দেশ্য কতখানি সফল হইয়াছে, সহৃদয় পাঠকেরাই তাহার বিচার করিবেন।

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাস

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলা দেশের শাসন-ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতে আসে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাণিজ্য-বিস্তার ও রাজস্ব-সংগ্রহ কার্যেই ব্যস্ত ছিল। দেশে শিক্ষা-বিস্তারের দিকে কোম্পানির কোন নজর ছিল না। ১৮১৩ সালের ইস্ট ইণ্ডিয়া আইন অনুসারে শিক্ষাখাতে খরচ করিবার জন্য গভর্নর জেনারেলের হাতে বাৎসরিক ১,০০,০০০ টাকা মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু এই টাকা উচ্চশিক্ষা বিস্তারের জন্যই ব্যয়িত হইতে থাকে। তৎকালীন শাসক-গোষ্ঠী 'চুইয়ে-যাওয়া' নীতিতে (infiltration theory) বিশ্বাস করিতেন। তাঁহাদের ধারণা ছিল, দেশের কতকগুলি লোককে উচ্চ-শিক্ষা দিলে তাহারাই ক্রমে ক্রমে দেশে শিক্ষা-বিস্তার করিবে।

সরকার শিক্ষা-বিস্তারের জন্য বিশেষ কিছু না করিলেও খ্রীষ্টান ধর্মযাজকগণ শিক্ষা-বিস্তারের চেষ্টা করেন। ১৮১৪ সালে মে সাহেব চুঁচুড়ার সন্নিকটে ১৬টি বিদ্যালয় খুলেন। এই বিদ্যালয়গুলি অল্প সময়ের মধ্যে জনপ্রিয় হইয়া উঠে এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ছেলেরা এই বিদ্যালয়ে পড়িতে যায়। সরকার হইতে এই সকল বিদ্যালয়কে মাসিক ৬০০ টাকা সাহায্যদান করা হয়। ক্রমে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৫ হইতে ৩৬ হইলে সাহায্য বাড়াইয়া মাসিক ১৮০০ টাকা করা হয়।

১৮১৯ সালে গভর্নর জেনারেলের পৃষ্ঠপোষকতায় Calcutta School Society স্থাপিত হয়। এই সোসাইটি কলিকাতায় কতকগুলি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮২৩ সালে তৎকালীন সরকার এই

সোসাইটির কাজে সন্তুষ্ট হইয়া বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য মাসিক ৫০০ টাকা সাহায্য দান করেন। স্কুল সোসাইটি শিক্ষকদের শিক্ষার ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন।

১৮৩৫ সালে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক বাংলা দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা পর্যালোচনা করিবার জন্য Adam নামে একজন ধর্মযাজককে Special Commissioner নিযুক্ত করেন। Adam সাহেব report দেন যে, জনসাধারণের শিক্ষার জন্য বাংলা দেশে আনুমানিক ১,০০,০০০ লক্ষ বিদ্যালয় আছে। তাঁহার মতে বাংলা দেশের উন্নত জেলাগুলিতে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের শতকরা ১৬ জন কোন-না-কোন রকম বিদ্যালয়ে পাঠ করিতেছে এবং অনুন্নত জেলাগুলিতে শতকরা ২.৫ জন শিশুর শিক্ষা-ব্যবস্থা আছে। সমগ্র বাংলা দেশে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের শতকরা ৭ জন বিদ্যালয়ে যায়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ১৮৩৫ সালে সমগ্র বাংলা দেশে শতকরা ৯৩ জন ছেলেমেয়ের কোন রকম লেখাপড়ার ব্যবস্থা ছিল না।

Adam সাহেব যে সকল সুপারিশ করেন, তাহার মধ্যে প্রধান প্রধান কয়টি নিম্নে দেওয়া হইল :—

(১) দেশীয় বিদ্যালয়ের উন্নতি-সাধন করিতে হইলে শিক্ষকদের যোগ্যতা বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং বিদ্যালয় পরিদর্শন করিবার জন্য পরিদর্শক নিযুক্ত করিতে হইবে।

(২) মধ্যে মধ্যে পরিদর্শকেরা ছেলেদের পরীক্ষা লইবেন এবং পরীক্ষার ফলের উপর শিক্ষকদের সাহায্য নির্ধারিত হইবে।

(৩) শিক্ষকদের শিক্ষণের জন্য প্রত্যেক জেলায় একটি করিয়া Normal School স্থাপন করিতে হইবে।

(৪) যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের সাহায্যের জন্য প্রত্যেক বিদ্যালয়ের সঙ্গে কিছু জায়গির থাকিবে।

(৫) এই পরিকল্পনা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য প্রথমে কয়েকটি জেলা বাছিয়া লইতে হইবে।

(৬) দেশের লোকসংখ্যা, শিক্ষার ব্যবস্থা, বিদ্যালয়ের অবস্থা ও ছাত্র-সংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে পর্যালোচনা (survey) করিবার ব্যবস্থা করা উচিত।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, Adam-এর এই সুপারিশ কার্যকরী করা হয় নাই।

১৮৪৪ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ যখন গভর্নর জেনারেল তখন সরকার স্থির করেন যে, বাংলার কয়েকটি জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয় মঞ্জুর করা হইবে। ১০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমস্ত ব্যয়ভার সরকার বহন করিবেন এবং এখানে উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করা হইবে। এই বিদ্যালয়গুলি সেই সেই গ্রামে স্থাপিত হইবে যেখানকার অধিবাসীরা বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ করিবেন এবং ইহার মেরামত করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। ছাত্র-পিছু মাসে এক আনা করিয়া ফি ধার্য করা হইবে বলিয়া স্থির করা হয়। শিক্ষক মহাশয়দের উৎসাহ দান করিবার জন্য ছাত্রদের নিকট হইতে আদায়কৃত অর্থের কিছু অংশ শিক্ষক মহাশয়েরা পাইবেন।

১৮৫৪ সালের নির্দেশ-নামাতে (Despatch) বলা হয় যে, সরকার অন্যান্য পর্যায়ে শিক্ষার সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের দিকে লক্ষ্য রাখিবেন। ১৮৫৯ সালে যে দ্বিতীয় নির্দেশ-নামা (Despatch) বাহির হয়, তাহাতে সরকারী কর্মচারীর কর্তৃত্বাধীনে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিবার কথা ছিল। পল্লী-অঞ্চলে শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করিবার উদ্দেশ্যে কর স্থাপন করিবার কথাও ছিল।

কিন্তু বাংলা দেশে মন্বন্তর হওয়ায় Famine Commission-এর নির্দেশ অনুসারে শিক্ষা-কর বসাইবার প্রস্তাব বাতিল হয় এবং ব্যাপক শিশু ও গণ-শিক্ষার পরিকল্পনাও বাতিল হয়। এখন বাংলার কয়েকটি জেলায় Circle School নীতি গৃহীত হয়। এই পদ্ধতি অনুসারে

একজন প্রধান গুরু নিয়োগ করা হইত এবং তিনি নিকটবর্তী বিদ্যালয়-গুলি পরিদর্শন করিয়া শিক্ষক মহাশয়দের উপদেশ দিবেন।

১৮৫৪ সালের নির্দেশ-নামায় দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে :— (১) প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারে সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ এবং (২) সাহায্য-দান প্রথা। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের কাজ বেশী অগ্রসর হয় নাই।

লর্ড রিপন ভারতের গভর্নর জেনারেল হইয়া আসিয়া ১৮৮২ সালে হাণ্টার সাহেবের সভাপতিত্বে একটি শিক্ষা কমিশন নিযুক্ত করেন। ভারতের চল্‌তি শিক্ষা-ব্যবস্থা পর্যালোচনা করিয়া শিক্ষা-বিস্তারের পন্থা নির্দেশ করাই এই কমিশনের উদ্দেশ্য ছিল। দেশ হইতে নিরক্ষরতা দূর করা সরকারের কর্তব্য বলিয়া এই কমিশন অভিমত প্রকাশ করেন এবং কতকগুলি সুপারিশ করেন :—

(১) জীবনে কর্তব্য-সাধন করিবার জন্য যাহাতে উপযুক্ত হইতে পারে মাতৃভাষার মাধ্যমে সেই শিক্ষা দান করাই প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য। প্রাথমিক শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার নিম্নতম স্তর বলিয়া মনে করা ঠিক নহে।

(২) Upper Primary বা Lower Primary পরীক্ষা আবশ্যিক করার প্রয়োজন নাই।

(৩) প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের জন্য আইন পাস করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

(৪) যদি কোন স্থানে গ্রাম্য বিদ্যালয় থাকে, তাহা হইলে তাহার উন্নতি-বিধানের জন্য সরকারের সাহায্য দান করা উচিত।

(৫) পরিদর্শকেরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়া পরীক্ষা করিবেন এবং যে সব বিদ্যালয় সাহায্য পাইবে, সেই সকল বিদ্যালয় অবশ্যই পরিদর্শন করিতে হইবে।

(৬) পরীক্ষার ফলের উপর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাহায্যের পরিমাণ নির্ভর করিবে। অনগ্রসর অঞ্চলের বিদ্যালয় সম্বন্ধে বা বিশেষ কারণবশতঃ এই নীতির ব্যতিক্রম হইতে পারে।

(৭) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গৃহ ও আসবাব-পত্র খুবই সাধারণ হইবে।

(৮) প্রাথমিক পরীক্ষার মান উন্নত করিতে হইবে এবং গণিত, হিসাব, প্রকৃতি-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় ইহার অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। কৃষি, স্বাস্থ্য ও শিল্প সম্বন্ধে অর্জিত জ্ঞান যাহাতে নিয়োগ করিতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(৯) শিশুদের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য বিদ্যালয়ে দেশীয় খেলাধূলা ও ব্যায়ামের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(১০) দেশে এরূপভাবে Normal School স্থাপন করিতে হইবে যাহাতে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকদের শিক্ষালাভের সুযোগ হইতে পারে।

(১১) Municipal এবং Local Board কর্তৃক পরিচালিত বিদ্যালয়ে সকল ছাত্রের বেতন হইতে রেহাই দেওয়ার প্রয়োজন নাই।

(১২) Board School-এ কতকগুলি ছাত্রের তাহাদের দারিদ্র্যের জন্য বিনা বেতনে পড়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(১৩) বিদ্যালয়ে ছাত্রদের বেতন বাবদ যে টাকা আদায় হইবে, তাহা বিদ্যালয়ের পরিচালকদেরই হাতে থাকিবে।

(১৪) কৃষিপ্রধান ও অনগ্রসর গ্রামে বিদ্যালয়ের সময়ের কড়াকড়ি করা হইবে না।

(১৫) অনগ্রসর জেলা ও আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে শিক্ষা-বিস্তারের ভার সরকারের গ্রহণ করা উচিত।

(১৬) Local Board কর্তৃক পরিচালিত বা সাহায্যপ্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সকল জাতি ও শ্রেণীর ছাত্র পড়িতে পারিবে।

(১৭) আঞ্চলিক সংস্থার তহবিল ও প্রান্তিক সরকারের শিক্ষা-তহবিলে প্রাথমিক শিক্ষার দাবী অগ্রগণ্য বিবেচিত হইবে।

(১৮) Municipality ও সরকারের স্বায়ত্ত শাসন-বিভাগ শিক্ষার জন্য একটি পৃথক তহবিল খুলিবেন।

(১৯) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপর শিক্ষা-সংস্থার কর্তৃত্ব থাকিবে।

(২০) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ করিবেন Municipal বা Local Board ; কিন্তু এই নিয়োগের ব্যাপারে সরকারের অনুমতি প্রয়োজন হইবে।

এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, Hunter Commission প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও আবশ্যিক করিবার সুপারিশ করেন নাই।

১৮৮৬ সালের মধ্যে সাহায্যদান নীতির পরিবর্তন হয়। ছাপানো পাঠ্য-পুস্তক আবশ্যিকভাবে ব্যবহার করার জন্য সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়কে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। প্রত্যেক বিদ্যালয়কে হাজিরা বহি ও পরিদর্শন বহি রাখিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। এখন হইতে ১৯০৪ সাল পর্যন্ত পরীক্ষার ফল অনুসারে বিদ্যালয়ে সাহায্যদান নীতি চলিয়া আসিতে থাকে। ১৯০৬ সাল হইতে এই প্রথা একেবারে বন্ধ হইয়াছে।

১৮৯৯ সালে লর্ড কার্জন ভারতের গভর্নর জেনারেল হইয়া আসেন। ভারত সরকারের নির্দেশে Mr. Cotton ভারতের সর্বস্তরের শিক্ষা-ব্যবস্থার পর্যালোচনা করেন। ১৯০১ সালে সিমলাতে লর্ড কার্জনের সভাপতিত্বে শিক্ষা-বিভাগীয় উর্ধ্বতন কর্মচারীদের একটি সম্মেলন হয়। ১৯০৪ সালের ১১ই মার্চ গভর্নর জেনারেলের Council একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই প্রস্তাবে বলা হয়—"প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার সরকারের একটি প্রধান কর্তব্য।" এই প্রস্তাবে আরও বলা হয়—"District বা Municipal Board-এর শিক্ষা-তহবিলের উপর প্রাথমিক শিক্ষার দাবীই হইবে সর্বাধিক। ভবিষ্যতে District ও Municipal Board-এর

শিক্ষা-সম্বন্ধীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব (budget) জিলা-পরিদর্শকের মাধ্যমে শিক্ষা-অধিকর্তার নিকট অনুমোদনের জন্য পাঠাইতে হইবে।" আমরা দেখিতে পাইতেছি, ভারত সরকার এই সর্বপ্রথম স্বীকার করিয়া লইলেন যে, প্রাথমিক শিক্ষার দ্রুত বিস্তার সরকারের একটি প্রধান কর্তব্য।

১৯১০ সালের ১৯শে মার্চ শ্রীযুক্ত গোখেল Imperial Legislative Council-এ প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও আবশ্যিক করিবার উদ্দেশ্যে একটি বিল উত্থাপন করেন। সরকারের পক্ষ হইতে আশ্বাস দেওয়া হয় যে, প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইবে এবং সেইজন্য শ্রীযুক্ত গোখেল তাঁহার বিল প্রত্যাহার করেন। সেই বৎসরই Executive Council-এর একজন সভ্যের অধীনে শিক্ষা-বিভাগ খোলা হয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে বলা হয়। ১৯১১ সালের মার্চ মাসে শ্রীযুক্ত গোখেল পুনরায় অবৈতনিক ও আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা বিল উত্থাপন করেন। কিন্তু এই বিল Council কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইল। যদিও বিলটি প্রত্যাখ্যাত হয়, তথাপি সরকারের পক্ষ হইতে এই আশ্বাস দেওয়া হইল যে, প্রাথমিক শিক্ষা যাহাতে দ্রুত বিস্তৃত হয় সরকার সে বিষয়ে চেষ্টা করিবেন এবং ক্রমে ক্রমে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করিবার চেষ্টা করিবেন। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সরকার আরও বেশী টাকা ব্যয় করিবেন—এ প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়।

১৯১২ সালে সম্রাট পঞ্চম জর্জ ভারত প্রদর্শনে আসিয়া ভারতের নরনারীর মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। গোখেলের চেষ্টা ও সম্রাট পঞ্চম জর্জের অভিপ্রায়ের ফল আমরা দেখিতে পাই। ১৯১২ সালের ৩০শে জুলাই Under-Secretary of State প্রচার করেন, দিল্লী দরবারে সম্রাট পঞ্চম জর্জ যে ৩,৩০,০০০ পাউণ্ড শিক্ষার জন্য মঞ্জুর করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই এদেশে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইবে।

১৯১৩ সালে শিক্ষা-বিভাগ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাহার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রস্তাব করা হইয়াছিল :—

(১) প্রত্যেক প্রান্তিক সরকার প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের চেষ্টা করিবেন।

(২) উপযুক্ত স্থানে নূতন করিয়া উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হইবে এবং প্রয়োজনবোধে চল্‌তি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হইবে।

(৩) বোর্ড বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দ্বারাই প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের চেষ্টা করা হইবে। সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়কেও উৎসাহ দেওয়া হইবে।

(৪) বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্য হইতেই শিক্ষক নিযুক্ত করিবার চেষ্টা করা হইবে। শিক্ষকেরা অন্ততঃ মধ্য বাংলা পরীক্ষা পাস করিবেন এবং এক বৎসর শিক্ষা (training) গ্রহণ করিবেন। যদি কেহ কেবল উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষা পাস করিয়া থাকেন, তাহা হইলে শিক্ষকদের দুই বৎসর শিক্ষা (training) গ্রহণ করিতে হইবে।

(৫) শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকদের বেতন মাসিক ১২ টাকার কম হইবে না। তাঁহাদের বেতনের একটি স্কেল থাকিবে এবং তাঁহাদের pension বা provident fund-এর ব্যবস্থা থাকিবে।

(৬) কোন শিক্ষককে ৫০ জনের বেশী ছাত্র পড়াইতে হইবে না। শিক্ষক-প্রতি ছাত্রসংখ্যা ৩০ হইতে ৪০ হইলেই ভাল হয়। প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য একজন করিয়া শিক্ষক থাকিবেন।

(৭) মধ্য বাংলা (Middle Vernacular) বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ানো হইবে।

(৮) বিদ্যালয়-গৃহ স্বাস্থ্যকর স্থানে থাকিবে এবং তাহার জন্য সরকার কোন খরচ বহন করিবেন না।

এই প্রস্তাবের ফলস্বরূপ দেখা যায় যে, বাংলা সরকার পঞ্চায়তী ইউনিয়ন স্কীম (Panchayati Union Scheme) নামে প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। প্রতি ইউনিয়নে একটি করিয়া আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ইহার সমগ্র ব্যয় সরকার বহন করেন। এই সকল বিদ্যালয়ে তিনটি করিয়া শ্রেণী থাকিত এবং নিম্ন প্রাথমিক Standard পর্যন্ত এখানে পড়ানো হইত। যদিও এই সকল বিদ্যালয়ের সমগ্র ব্যয়ভার সরকার বহন করিতেন, তথাপি এই বিদ্যালয়-গুলির পরিচালনার ভার জেলা বোর্ডের উপর ন্যস্ত ছিল। কিন্তু এই পরিকল্পনা কার্যকরী হয় নাই। তাহার কারণ—(১) এগুলির স্থান-নির্ণয় ঠিক হয় নাই; (২) শিক্ষকদের যথেষ্ট বেতন দেওয়া হইত না; (৩) এই বিদ্যালয় অবৈতনিকও ছিল না এবং ছাত্রদের নিকট হইতে যে বেতন আদায় হইত, তাহার কোন অংশই শিক্ষকেরা পাইতেন না; (৪) পূর্ণ প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা এখানে ছিল না। এই পরিকল্পনা কার্যকরী না হইলেও ইহার বিশেষত্ব এই যে, ইহাই সরকার-পরিচালিত প্রাথমিক শিক্ষার প্রথম সোপান।

১৯১৭ সালে বৃটিশ পার্লামেণ্ট ভারতবর্ষকে স্বায়ত্ত শাসনের কিছুটা সুযোগ দেন। প্রত্যেক প্রদেশে তখন হইতে শিক্ষা-বিস্তারের দিকে আগ্রহ দেখা দিল। ১৯১৯ সালে বাংলা দেশে বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষা আইন (Bengal Primary Education Act) পাস হইল। ইহার প্রধান প্রধান ধারাগুলি হইল নিম্ন প্রকার ঃ—

(ক) প্রথমতঃ, ইহা সকল Municipal অঞ্চলে প্রযোজ্য হইবে। তাহার পর বাংলা সরকার ক্রমশঃ ইউনিয়ন বোর্ড অঞ্চলে ইহা প্রয়োগ করিতে পারেন।

(খ) এই আইন পাস হইবার এক বৎসরের মধ্যে বা সরকার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রত্যেক Municipality তাহার এলাকায় শিক্ষা-ব্যবস্থা

সম্বন্ধে পর্যালোচনা করিয়া নিম্নলিখিত বিষয়ে সরকারের নিকট একটি বিবরণী পেশ করিবেন ঃ—

(১) ৬ হইতে ১০ বৎসর বয়স্ক ছেলেমেয়ের সংখ্যা।

(২) চল্‌তি বিদ্যালয়গুলির ছাত্র ভর্তি করিবার ক্ষমতা, শিক্ষকদের সংখ্যা ও যোগ্যতা এবং ছাত্রদের উপস্থিতি।

(৩) যদি ৬ হইতে ১০ বৎসরের সব ছেলেমেয়ে স্কুলে আসে, তাহা হইলে কতগুলি অতিরিক্ত বিদ্যালয় ও শিক্ষক লাগিবে।

(৪) Municipality শিক্ষাখাতে এখন কত খরচ করে এবং ৬ হইতে ১০ বৎসরের সকল শিশুর শিক্ষা-ব্যবস্থা করিতে হইলে আরও কত টাকা দরকার হইবে।

(৫) শিক্ষা সেস্‌ বসাইলে তাহা হইতে কত টাকা আয় হইতে পারে।

(৬) প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিকভাবে চালু করিতে হইলে Municipality সরকারের নিকট হইতে কত টাকা সাহায্য প্রার্থনা করিবে।

সরকারের নির্দেশ পালন করার পর Municipality যদি প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিকভাবে প্রবর্তন করিতে ইচ্ছুক হয়, তাহা হইলে সরকারের নিকট অনুমতি চাহিতে হইবে।

মিউনিসিপ্যাল কমিশনাররা সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া একটি স্কুল কমিটি নিয়োগ করিবেন।

প্রাথমিক শিক্ষা সাধারণতঃ অবৈতনিক হইবে না। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিকভাবে প্রবর্তন করা হইলে যদি কোন অভিভাবক স্কুল কমিটিকে বুঝাইতে পারেন যে, তিনি তাঁহার ছেলের বেতন দিতে অক্ষম, তাহা হইলে তাঁহার ছেলেকে বিনা বেতনে পড়িবার সুযোগ দেওয়া হইবে।

যদি প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিকভাবে প্রবর্তন করিবার জন্য Muni-

cipality-র অর্থ সংকুলান না হয়, তাহা হইলে সরকারের অনুমতি-সাপেক্ষে Municipality শিক্ষা সেস্ (Cess) বসাইতে পারে।

১৯২১ সালে প্রাথমিক শিক্ষা-বিষয়ক আইন ইউনিয়ন বোর্ড অঞ্চলে প্রয়োগ করা যাইতে পারে বলিয়া সরকার ইহার সংশোধনী প্রস্তাব পাস করেন।

১৯২৩ সালে বাংলা সরকার প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতিকল্পে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার জন্য Mr. Bissকে নিয়োগ করেন। Mr. Biss প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতির জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশ করেন :—

(১) **বিদ্যালয়ের পুনর্বিন্যাস** :—বর্তমানে কোন কোন স্থানে পরস্পর প্রতিযোগী অনেকগুলি বিদ্যালয় আছে, আবার কোন কোন স্থানে বিদ্যালয়ের অভাব দেখা যায়। বিদ্যালয় এমনভাবে পুনর্বিন্যাস করিতে হইবে যাহাতে যে-কোন বসতিপূর্ণ স্থানের অর্ধ মাইলের মধ্যে যেন একটি বিদ্যালয় থাকে।

(২) **ছাত্রদের একত্রীকরণ** :—একটি বিদ্যালয়ের অর্ধ মাইল পরিধির মধ্যে বিদ্যালয়ে পড়িবার উপযুক্ত কতকগুলি ছেলেমেয়ে থাকিবে। তাহাদের পড়িবার স্থান সংকুলান করিতে হইবে। যদি কোন অঞ্চলে ৪০০ ছেলেমেয়ে থাকে, তাহা হইলে ৩০০ ছাত্রের পড়িবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যদি কোন অঞ্চলে ৬৫টি ছেলে থাকে, তাহা হইলে অন্ততঃ ৫০টি ছেলের উপযুক্ত বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ করিতে হইবে। বিদ্যালয়ে সকল জাতি ও শ্রেণীর ছেলেমেয়ে পড়িতে পাইবে।

(৩) **জনপ্রিয়তা** :—স্থানীয় জনসাধারণ যে রকম শিক্ষা দ্বারা তাহাদের উপকার হইবে বলিয়া মনে করিবে, বিদ্যালয়ে সেই রকম শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে হইবে। যদি লোকে চায়, তাহা হইলে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ইংরাজী শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৪) **সংযোগ স্থাপন**ঃ—যেমন যেমন বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে তেমনি তাহাদের প্রাথমিক পরীক্ষায় যোগ দিতে পারিবে। এইরূপে ছোট ও বড় বিদ্যালয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হইবে।

শিক্ষার ব্যয় সম্বন্ধে Mr. Biss নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করেন ঃ—

(১) ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বাংলা দেশে শিক্ষার খাতে ব্যয় খুবই কম। বাংলা দেশে একটি ছেলের পড়ার জন্য খরচ হয় বৎসরে ৩·৫ টাকা, আর বোম্বাইয়ে হয় ১৫ টাকা।

(২) বাংলা দেশের লোকেরা শিক্ষার জন্য খরচ করে সর্বাপেক্ষা বেশী। বাংলা দেশে গড় বাৎসরিক বেতনের হার ১ টাকা হইতে ॥৶০ আনা, কিন্তু অন্যান্য প্রদেশে ছাত্র-বেতনের হার ইহার অর্ধেক।

(৩) সাধারণ তহবিল হইতে শিক্ষার খাতে বাংলা দেশে খরচ হয় সবচেয়ে কম। এখানে ছাত্র-পিছু সরকার হইতে বৎসরে খরচ হয় ·০২৯ টাকা, আর বোম্বাইয়ে খরচ হয় ·২৬৫ টাকা।

সরকার Mr. Biss-এর পরিকল্পনা আংশিকভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে বিদ্যালয়ের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া গেল এবং প্রতি বৎসর অধিকতর ছাত্র বিদ্যালয়ে আসিতে লাগিল। শীঘ্রই দেখা গেল, বাংলা দেশে প্রতি ২ বর্গমাইল পরিমিত স্থানের জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইল এবং প্রতি বিদ্যালয় ২·২ গ্রামের শিক্ষার খোরাক যোগাইতে লাগিল।

Biss-এর পরিকল্পনার ফলে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়িলেও শিক্ষার বিশেষ অগ্রগতি হইল বলিয়া মনে হয় না। কারণ দেখা গেল, শিক্ষায় অপচয় হইতেছে প্রচুর। Infant Class-এর ১০০ শিশুর মধ্যে ৩০টি যায় Class I-এ, ২০টি Class II-তে এবং ৫টি Class III-তে ও ৩টি Class IV-এ। এই অপচয় নিবারণ করিবার জন্য এবং ১৯১৯ সালের শিক্ষা আইনের দোষ-ত্রুটি দূর করিবার জন্য ১৯৩০ সালে বঙ্গীয় (গ্রাম্য)

প্রাথমিক শিক্ষা আইন (Bengal 'Rural' Primary Education Act) পাস হইল।

১৯৩০ সালের শিক্ষা আইনের বলে প্রত্যেক জেলায় District School Board স্থাপিত হইল। কতকগুলি শর্তাধীনে District School Board ইহার নির্দিষ্ট এলাকায় বিদ্যালয় স্থাপন করিতে, পরিচালনা করিতে ও সাহায্য দিতে পারিবে। নিম্নলিখিত সভ্য লইয়া District School Board গঠিত হইবে :—

(ক) (১) প্রথম আট বৎসর জেলা-শাসক, (২) মহকুমা শাসকেরা, (৩) জেলা বিদ্যালয়-পরিদর্শক (ইহারা পদাধিকারবলে সভ্য হইবেন)।

(খ) বে-সরকারী সভ্য :—(১) District Board-এর Chairman ও Vice-Chairman ; (২) Local Board-এর Chairman.

(গ) বে-সরকারী নির্বাচিত সভ্য :—(১) যতগুলি মহকুমা আছে ততজন সভ্য District Board-এর সভ্যদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন ; কিন্তু সভ্যসংখ্যা দুইজনের কম হইবে না। (২) প্রত্যেক মহকুমা হইতে একজন করিয়া সভ্য Union Board-এর সভ্যদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন ; কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই সভ্যসংখ্যা দুইজনের কম হইবে না। (৩) প্রাথমিক শিক্ষকদের দ্বারা মনোনীত একজন শিক্ষক-সভ্য। প্রথম চারি বৎসর শিক্ষক-সভ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত করা হইবে।

(ঘ) বে-সরকারী (মনোনীত) সভ্য :—যতগুলি মহকুমা আছে ততগুলি সভ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

District Board-এর বেশীর ভাগ সভ্য হইবেন বে-সরকারী। প্রত্যেক বোর্ড প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবে, প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা করিবে, সাহায্য দান করিবে, প্রাথমিক বিদ্যালয়কে মঞ্জুরি দান করিবে, বোর্ডের আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করিবে এবং শিক্ষক নিয়োগ ও তাঁহাদের বেতন দিবার ব্যবস্থা করিবে।

প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের প্রধান বাধা হইতেছে অর্থের অভাব। শিক্ষা সেস্ আদায় করিয়া সরকার অর্থাভাব দূর করিবেন মনে করেন। শিক্ষা সেস্ টাকায় ⁄৫ পয়সা হিসাবে বসানো হইয়াছে, ইহার মধ্যে কৃষক দিবে ৴১৭৷৷ পয়সা এবং জমিদার দিবে ৴৭৷৷ পয়সা। যাঁহারা ব্যবসায়-বাণিজ্য বা কোন রকম বৃত্তির দ্বারা জীবিকা অর্জন করেন, তাঁহাদের নিকট শিক্ষা সেস্ আদায় করা হয় না। সেইজন্য জেলা-শাসক এই সব লোকের নিকট হইতে শিক্ষা-কর (Education Tax) আদায় করিতে পারেন।

সরকারকে স্কুল বোর্ড সংক্রান্ত সকল বিষয়ে পরামর্শ দিবার জন্য বাংলা দেশে একটি কেন্দ্রীয় প্রাথমিক সমিতি থাকিবে। এই সমিতির সভ্য হইবেন (১) শিক্ষা-অধিকর্তা, (২) District School Board-এর সভ্যদের কর্তৃক নির্বাচিত ১০ জন সভ্য, (৩) সরকার কর্তৃক মনোনীত ৫ জন সভ্য। ইঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ দুইজন অনুন্নত শ্রেণীর লোক হইবেন।

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হইল এবং বাংলা দেশ দুই ভাগে বিভক্ত হইল। ১৯৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। এই কমিটির উদ্দেশ্য ছিল, চল্‌তি শিক্ষা-ব্যবস্থার সমালোচনা করিয়া সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থা সংস্কারের পন্থা নির্ধারণ করা। এই কমিটি সুপারিশ করেন যে, বাংলা দেশে বিদ্যালয়ের শিক্ষা ১০ বৎসরের পরিবর্তে ১১ বৎসর-ব্যাপী হইবে। প্রাথমিক শিক্ষার কাল ৬ হইতে ১০ বৎসরের পরিবর্তে ৬ হইতে ১১ বৎসর পর্যন্ত হইবে—অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত থাকিবে। এই কমিটি ইহাও সুপারিশ করেন যে, প্রাথমিক স্তরে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তন করা হইবে। কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী স্থির হয়, ক্রমে ক্রমে সমস্ত চল্‌তি প্রাথমিক বিদ্যালয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পরিবর্তিত হইবে। এই পরিবর্তন যাহাতে দ্রুত হয়,

সে জন্য প্রাথমিক ও বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে একই পাঠ্য-সূচী অনুসরণ করা হইবে।

১৯৩০ সালে প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাস হইলেও বাংলা দেশে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও আবশ্যিকভাবে সর্বত্র চালু হয় নাই। District School Board-এর অন্তর্গত পল্লী-অঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের বেতন দিতে হয় না সত্য, কিন্তু ৬ হইতে ১০ বৎসরের সব ছেলেমেয়েকে বাধ্যতামূলকভাবে বিদ্যালয়ে আনা সম্ভব হয় নাই। শহরাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিকও নহে এবং আবশ্যিকও নহে। কেবলমাত্র কলিকাতা, দার্জিলিং ও বোলপুর মিউনিসিপ্যাল অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রবর্তন করা হইয়াছে।

১৯৫০ সালে পশ্চিমবাংলা সরকার প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিকভাবে চালু করিবার জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। স্থির হয় যে, প্রতি বৎসর প্রত্যেক জেলায় কিছু কিছু অংশে প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিকভাবে প্রবর্তন করা হইবে, যাহাতে ১০ বৎসরের মধ্যে সমগ্র বাংলাদেশের সর্বত্র ৬ হইতে ১০ বৎসরের সকল শিশুই বিদ্যালয়ে যাইতে পারে। যাহাতে কম খরচে কার্য সিদ্ধ হয় সেজন্য চল্‌তি বিদ্যালয়ে দিনে দুই বা তিন বার স্কুল বসিবার ব্যবস্থা করা হয়। তিন বৎসর এই পরিকল্পনা চালু করিবার চেষ্টা করা হয়। যে সকল পড়ুয়া বয়সের ছেলেমেয়ে বিদ্যালয়ে যাইত না, তাহাদের কিছু অংশ বিদ্যালয়ে আসিতে লাগিল, কিন্তু এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী হইল না।

১৯৩০ সালের প্রাথমিক শিক্ষা আইনে ব্যবস্থা আছে যে, যদি কোন অভিভাবক তাঁহার ছেলে বা মেয়েকে বিদ্যালয়ে না পাঠান, তাহা হইলে তাঁহাকে শাস্তি দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক করিবার জন্য আইনের সাহায্য খুব কম ক্ষেত্রেই লওয়া

হইয়াছিল। ১৯৫০ সালে প্রাথমিক শিক্ষা আইনের আংশিক সংশোধন করা হয়, যাহাতে কোন ছেলেমেয়েকে একবার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করিলে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হইবার পূর্বে ছাড়াইয়া লওয়া চলিবে না। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৬—১০ বৎসর বয়স্ক সকল ছেলেমেয়েকে বিদ্যালয়ে আনাও সম্ভব হইল না এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অপচয়ও বন্ধ করা গেল না।

১৯৫৩ সালে ভারত সরকার বেকার সমস্যা দূর করিবার জন্য শিক্ষা-বিস্তার ও সমাজ-সেবার এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে বাংলা দেশের পল্লী-অঞ্চলে প্রায় ৭৫০০টি নূতন বিদ্যালয় স্থাপিত হইল এবং ২০,০০০ জন শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। বাংলা দেশে ৬ হইতে ১০ বৎসরের ছেলেমেয়ে আছে ৩০,০০,০০০ ; তাহার মধ্যে ২০,০০,০০০ ছেলেমেয়ে আজ বিদ্যালয়ে যাইতেছে। অর্থাৎ শতকরা ৭০ জন ছেলেমেয়ে বিদ্যালয়ে যাইতেছে এবং বাকী শতকরা ৩০ জন ছেলেমেয়েকে এখন বিদ্যালয়ে আনিতে হইবে।

———

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিক্ষা-ব্যবস্থার ঐতিহাসিক পরিক্রমা

বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার শুরু ঃ

মাধ্যমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থার সহিত সম্যক্ পরিচয় লাভ করিতে হইলে বিভিন্ন সময়ে সরকার যে সকল নির্দেশ দিয়াছেন এবং বিভিন্ন কমিটি যে সকল সুপারিশ করিয়াছেন,'তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা প্রয়োজন। গত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া মাধ্যমিক শিক্ষা-সংস্কারের চেষ্টা কোন্ দিকে বহিতেছে, তাহার একটা মোটামুটি ধারণা আমাদের থাকা উচিত।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সময়োপযোগী করিবার জন্য সরকার তৎকালীন চল্‌তি শিক্ষা-ব্যবস্থার পর্যালোচনা করান এবং তখন হইতেই বর্তমান ব্যবস্থার শুরু বলা যাইতে পারে। লর্ড মেকলে শিক্ষায় যে নীতি নির্ধারণ করিয়াছিলেন সেই অনুসারে লর্ড বেন্টিঙ্ক এক নির্দেশ জারি করেন, "ভারতবাসীদের মধ্যে ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান-বিস্তার করাই বৃটিশ সরকারের উদ্দেশ্য ; শিক্ষার জন্য যে টাকা বরাদ্দ করা হইবে তাহা ইংরাজী শিক্ষাবিস্তারের জন্য খরচ করাই ভাল।" যে সমস্ত স্কুল ও কলেজে দেশীয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকিবে, সেখানেও সাহায্যের উল্লেখ ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই এই দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করা হয়। মেকলের নির্দেশ ও ১৮৩৫ সালের সরকারী বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য এদেশে কতকগুলি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি মনীষিগণের চেষ্টায় এই নূতন বিদ্যালয়গুলি বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠে।

১৮৪৪ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ ঘোষণা করেন যে, যাঁহারা ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, সরকারী চাকুরিতে তাঁহাদের দাবী অগ্রগণ্য বিবেচিত হইবে। কাজেই এই সকল নূতন বিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য হইল, ছাত্রদের সরকারী চাকুরি পাইবার যোগ্যতা অর্জন করানো; জীবনে তাহাদের উপযুক্ত নাগরিক করিবার কোন প্রচেষ্টা দেখা যায় নাই। ইংরাজী বিদ্যালয়গুলিতে পুঁথিগত বিদ্যার মান বেশ উচ্চ ছিল; কিন্তু বিজ্ঞানের বাস্তব দিকটার বিশেষ উন্নতি হয় নাই। বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির গলদগুলির জন্য প্রধানতঃ দায়ী প্রথম দিকে সরকারের শিক্ষা-নীতি।

১৮৫৪ সালের সরকারী নির্দেশ :

১৮৫৩ সালের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে কতকগুলি গুরুতর সমস্যা দেখা যায়, যাহার জন্য অনুসন্ধানের পর ১৮৫৪ সালে Wood's Despatch নামে একটি নির্দেশনামা বাহির হইল। এই নির্দেশ অনুযায়ী শিক্ষা-অধিকর্তার (Director of Public Instruction) অধীনে শিক্ষা-বিভাগ স্থাপিত হইল। পরীক্ষা গ্রহণ ও উপাধি দিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়। ১৮৫৪ সালের নির্দেশনামাতে কয়েকটি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনের কথা ছিল। ইহার এক জায়গায় বলা হইয়াছে, "দেশের অধিবাসীদের বড় একটা অংশ সত্যিকার শিক্ষা হইতে বঞ্চিত আছে; জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে কাজে লাগে এমন বাস্তব শিক্ষা-বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা সরকার অনুভব করেন এবং ইহার জন্য সরকার অধিকতর অর্থ ব্যয় করিতে প্রস্তুত আছেন।"

১৮৫৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মাধ্যমিক শিক্ষার উপর সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন দেখা দিল। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি সর্বতোভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতার মধ্যে আসিল। এখন হইতে মাধ্যমিক শিক্ষা ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনযাত্রার উপযোগী স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থা না হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল।

১৮৫৪ সাল হইতে ১৮৮২ সালের মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় কতকগুলি গলদ দেখা দিল। শিক্ষার বাহন হিসাবে মাতৃভাষার ব্যবহার একরকম উঠিয়া গেল বলা যাইতে পারে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষণের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। বৃত্তিবিষয়ক ও কারিগরী শিক্ষার কোন ব্যবস্থা না থাকায় মাধ্যমিক শিক্ষা দৈনন্দিন জীবনের সহিত সম্বন্ধবিহীন একান্ত পুঁথিগত বিদ্যায় পরিণত হইল। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার আর একটি প্রধান গলদ দেখা দিল—প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের তৈয়ারি করা মাধ্যমিক এমন কি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির একমাত্র লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইল।

১৮৮২ সালের হাণ্টার কমিশন ঃ

দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা পর্যালোচনা করিবার এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চল্‌তি শিক্ষা-ব্যবস্থার দোষগুণ নির্ধারণ করিবার জন্য ১৮৮২ সালে সরকার 'হাণ্টার কমিশন' নিযুক্ত করেন। যে সব ছেলেমেয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠ শেষ করে, তাহাদের বেশীর ভাগই মধ্য বিদ্যালয় বা বড় জোর উচ্চ বিদ্যালয়ের বেশী পড়াশুনা করিবে না। অতএব বিদ্যালয়ের শিক্ষা যতদূর সম্ভব ভাল হওয়া উচিত। এই বিষয়ে কোন কোন প্রদেশে কিছুটা উন্নতি-বিধান নিশ্চয়ই করা যাইতে পারে।

সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিচালন-ভার সরকারকে গ্রহণ করিতে হইলে বহু টাকার দরকার। সেইজন্য সরকার প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনা করিবার ভার গ্রহণ করিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের হাতে ছাড়িয়া দেন। কমিশন সুপারিশ করিয়াছিলেন যে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি যতদূর সম্ভব সরকারী সাহায্যে পরিচালিত হওয়া উচিত এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনার ভার সরকারের যত শীঘ্র সম্ভব পরিত্যাগ করা উচিত।

এই হাণ্টার কমিশনের রিপোর্ট হইতে সেই সময় মাধ্যমিক শিক্ষার

প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারা যায়। তাহা ছাড়া এই স্তরে শিক্ষা সম্বন্ধে যে সুপারিশ এই কমিশন করিয়াছেন, তাহারও যথেষ্ট মূল্য আছে। বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরে বিভিন্নমুখী শিক্ষার যে প্রস্তাব হইয়াছে, হাণ্টার কমিশন সে সম্বন্ধেও চিন্তা করিয়াছিলেন। কমিশন সুপারিশ করিয়াছিলেন যে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিশেষ কোন শ্রেণী হইতে ছাত্রদের শিক্ষা-ব্যবস্থা বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হওয়া উচিত—একদিকে ছাত্রদের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করিবে, আর একদিকে ব্যবসায়-বিষয়ক, কারিগরী বা অন্য প্রকার বাস্তব জীবনের প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে। কিন্তু কি সরকার, কি জনসাধারণ এই সুপারিশগুলির বিশেষ কোন গুরুত্ব দান করেন নাই।

১৮৮২ হইতে ১৯০২ সালের মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা বিশেষ প্রসার লাভ করে নাই। জনসাধারণের চেষ্টায় ও সরকারী সাহায্যে বিদ্যালয়ের সংখ্যা যথেষ্ট বাড়িয়া যায় বটে, কিন্তু ইহাদের উৎকর্ষ-সাধনের দিকে লক্ষ্য করা হয় নাই; তাহার ফলে কতকগুলি ত্রুটি দেখা দিল।

১৯০২ সালের বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন ঃ

উচ্চ স্তরের পরীক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান সম্বন্ধে পর্যালোচনা করিবার জন্য সরকার 'বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন' নিযুক্ত করেন। এই কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষার উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব অধিক পরিমাণে স্থাপিত হয়। ১৯০৪ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুসারে স্থির হইল, বিশ্ববিদ্যালয়ই মাধ্যমিক বিদ্যালয় অনুমোদন করিবে এবং তাহার জন্য নিয়মাবলীও প্রস্তুত হইল।

মাধ্যমিক শিক্ষা-পর্ষৎ ঃ

মাধ্যমিক শিক্ষার উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাব দেখিয়া দেশের একদল লোক চিন্তা করিলেন যে, মাধ্যমিক শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতার বাহিরে স্বাধীনভাবে পরিচালিত হওয়া দরকার। এইজন্য কোন কোন

প্রদেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয়েরপাঠ্য-সূচী নির্ধারণ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠের শেষে পরীক্ষা পরিচালনা করিবার জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা-পর্ষৎ গঠিত হইল। আশা করা গিয়াছিল যে, School Leaving Certificate-এ ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যালয়ে থাকিবার সময় কোন্ বিষয়ে কিরূপ উন্নতি করিয়াছে এবং শেষ পরীক্ষাতেই বা কিরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, তাহার পূর্ণ বিবরণ থাকিবে। এই certificate দেখিয়া অফিসের কর্মকর্তারা যুবকদের কাজে নিযুক্ত করিতে পারিবেন এবং কলেজের অধ্যক্ষেরা ছাত্রদের যোগ্যতা অনুসারে কলেজের বিভিন্ন বিভাগে ভর্তি করিতে পারিবেন।

১৯১৭ সালের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন :

১৯১৭ সালে Sir Michael Sadlar-এর অধিনায়কত্বে 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন' নিযুক্ত হয়। এই কমিশন বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নত করিতে হইলে মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতি-বিধান করা একান্ত আবশ্যক। এই কমিশন যে সব সুপারিশ করিয়াছিলেন, তাহার প্রধান প্রধানগুলি নিম্নে দেওয়া হইল—

(১) মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মধ্যে রেখা টানিতে হইলে তাহা প্রবেশিকা পরীক্ষার পর না টানিয়া মাধ্যমিক পরীক্ষার পরই টানা উচিত।

(২) সরকারের মাধ্যমিক কলেজ নামে নূতন শিক্ষালয় স্থাপন করা উচিত ; এখানে কলা, বিজ্ঞান, চিকিৎসা-শাস্ত্র, ইন্‌জিনিয়ারিং ও শিক্ষকতা সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হইবে। এই শিক্ষালয়গুলি পৃথকভাবে অথবা বিশেষ বিশেষ উচ্চ বিদ্যালয়ের অংশ হিসাবে পরিচালনা করা যাইতে পারে।

(৩) মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতকার্যতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের ছাড়পত্র হইবে।

(৪) উচ্চ এবং মাধ্যমিক কলেজীয় শিক্ষার জন্য একটি বোর্ড স্থাপন করিতে হইবে। এই বোর্ডের হাতে মাধ্যমিক শিক্ষা পরিচালনার ভার থাকিবে।

'স্যাডলার কমিশন' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিল; কিন্তু ইহার সুপারিশগুলি এরূপ ব্যাপক যে, অনেক বিশ্ববিদ্যালয় ইহা কার্যে পরিণত করিতে আরম্ভ করে। স্যাডলার কমিশনই সর্বপ্রথম মাধ্যমিক কলেজের শ্রেণীগুলিকে উচ্চ বিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত করিয়া উচ্চ বিদ্যালয় ও মাধ্যমিক কলেজ-গুলির পরিচালনার জন্য মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ স্থাপনের কথা বলেন।

ইহার পরে মাধ্যমিক শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার হইয়াছে ও জনসাধারণের উৎসাহে এবং ব্যক্তিবিশেষের ও সংস্থার অর্থসাহায্যে গ্রাম ও শহর অঞ্চলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কিন্তু শিক্ষকের শিক্ষণ, তাঁহাদের বেতন এবং চাকুরির অবস্থার কোন উন্নতি হয় নাই। মাধ্যমিক শিক্ষার অভূতপূর্ব প্রসারের ফলে বিদ্যালয়ে পুথিগত শিক্ষাদানেরই ব্যবস্থা হইল, কিন্তু কারিগরী শিক্ষা বা বিদ্যালয়ে বহুমুখী বিশেষ কোন ব্যবস্থা হইল না।

হার্টগ কমিটি ঃ

১৯১৯ সালে এই দেশে শিক্ষা-ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য 'হার্টগ কমিটি' নিযুক্ত করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তাই মাধ্যমিক শিক্ষার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এই দোষ সংশোধন করিবার জন্য কমিটি সুপারিশ করেন, যে সকল ছেলে জীবনে কোন বৃত্তি অবলম্বন করিতে চায়, তাহারা নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে তাহাদের সাধারণ পাঠ শেষ করিবে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য-সূচী বহুমুখী হইবে। কমিটি ইহাও সুপারিশ করিয়াছিলেন যে, নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠ শেষ হইবার পর অধিক সংখ্যক ছাত্রের

শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে তাহারা ভবিষ্যতে কারিগরী ও শিল্প বিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষালাভে সুযোগ পাইতে পারে। কমিটি শিক্ষকদের শিক্ষণ ও চাকুরির অবস্থা সমালোচনা করিয়া বলেন যে, নয় মাসের শিক্ষায় শিক্ষক মহাশয়দের তাঁহাদের পুরাতন শিক্ষা-পদ্ধতি ভুলিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। কমিটির মতে শিক্ষকতার জন্য ভাল লোক আসে না এবং যতদিন পর্যন্ত শিক্ষকদের অবস্থা সন্তোষজনক না হয়, ততদিন ভাল লোককে শিক্ষকতার দিকে আকর্ষণ করা যাইবে না। ভারতবর্ষের কোন প্রদেশেই শিক্ষককে এমন বেতন দেওয়া হয় না যাহাতে তিনি উপযুক্ত পদমর্যাদা বজায় রাখিতে পারেন।

সাপ্রু কমিটি ঃ

১৯৩৪ সালে উত্তর প্রদেশের সরকার বেকার-সমস্যার কারণ নির্ধারণ করিবার জন্য 'সাপ্রু কমিটি' নিয়োগ করিয়াছিলেন। এই কমিটির মতে অশান্তির কারণ বেকার-সমস্যা। দেশের প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থা ছাত্রদের পরীক্ষায় পাস করিয়া উপাধি গ্রহণ করিতে শিক্ষা দেয়, কিন্তু কোন রকম বৃত্তি শিক্ষা দেয় না। কমিটির মতে এ সমস্যার সমাধান করিতে হইলে মাধ্যমিক শিক্ষা হইবে বহুমুখী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং ছাত্রদের জীবনে বিভিন্ন বৃত্তির উপযোগী হইবার সুযোগ দিতে হইবে। মাধ্যমিক শিক্ষা-স্তরে ছাত্র-ছাত্রীদের একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তুত করা হইবে, আর অন্যদিকে কারিগরী, শিল্প, বাণিজ্য ও অন্যান্য বৃত্তি সম্বন্ধীয় শিক্ষারও ব্যবস্থা থাকিবে।

কমিটির প্রধান প্রধান সুপারিশগুলি হইতেছে—

(১) মাধ্যমিক স্তরে বহুমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে; তাহার মধ্যে একটি ধারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির জন্য ছাত্রদের প্রস্তুত করিবে।

(২) মাধ্যমিক কলেজ (Intermediate College) উঠাইয়া দিয়া মাধ্যমিক শিক্ষার সময় এক বৎসর বাড়াইয়া দিতে হইবে। ছয়

বৎসরব্যাপী মাধ্যমিক শিক্ষাকে উচ্চ ও নিম্ন এই দুই স্তরে ভাগ করিতে হইবে। পাঁচ বৎসর প্রাথমিক ও ছয় বৎসর মাধ্যমিক শিক্ষার কাল নির্ধারিত হইবে। প্রথম আট বৎসর অর্থাৎ পাঁচ বৎসর প্রাথমিক ও তিন বৎসর নিম্ন-মাধ্যমিক শিক্ষা সকল ছাত্র-ছাত্রীর একই প্রকার হইবে।

(৩) নিম্ন-মাধ্যমিক স্তরের পরে বৃত্তিমূলক শিক্ষা আরম্ভ হইবে।

(৪) তিন বৎসরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী লাভ করা যাইবে।

এবট-উড রিপোর্ট (**Abbot-Wood Report**) :

১৯৩৬-৩৭ সালে Abbot ও Wood নামক দুইজন শিক্ষাবিদ্‌কে শিক্ষার সংস্কার বিশেষ করিয়া বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্বন্ধে উপদেশ দিবার জন্য সরকার আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীপ্রাপ্ত বহু ছাত্র কেন তাহাদের গুণানুযায়ী কোন কাজ পাইতেছে না, সে বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্যই এই দুই শিক্ষাবিদ্‌কে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। বিশেষ করিয়া নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে Abbot ও Woodকে অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করা হইয়াছিল :—

(১) প্রাথমিক, মাধ্যমিক বা উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে কোন বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়া সম্ভব কি না? যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে কি প্রকার ও কতটুকু শিক্ষা দেওয়া উচিত?

(২) বর্তমান কারিগরী ও বৃত্তিমূলক বিদ্যালয়গুলির উন্নতি-বিধান করা সম্ভব কি না? বৃত্তিমূলক শিক্ষা দিবার জন্য নূতন বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা আছে কি না? যদি প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে কি ধরনের বিদ্যালয় স্থাপন করা হইবে এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কোন্ শ্রেণী হইতে ছাত্রদের বৃত্তিমূলক বিদ্যালয়ে পাঠানো হইবে এবং ছাত্রদের কি উপায়ে বাছিয়া লওয়া যাইবে?

Abbot ও Wood-এর রিপোর্টে সাধারণ বিদ্যালয়ের মতই বিভিন্ন প্রকার কারিগরী ও বৃত্তিমূলক বিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করা হইয়াছে।

এই কমিটির সুপারিশগুলির প্রধান ফল এই হইয়াছে যে, Polytechnic নামে নূতন একপ্রকার কারিগরী শিক্ষালয় স্থাপিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া প্রত্যেক প্রদেশে কারিগরী, বাণিজ্য ও কৃষি বিষয়ক উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

সার্জেণ্ট রিপোর্ট :

ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কেন্দ্রীয় শিক্ষা-বিষয়ক পরামর্শদাতা সমিতি (All India Advisory Board of Education) ১৯৪৪ সালে যুদ্ধোত্তর শিক্ষোন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। ভারত সরকারের শিক্ষা-বিষয়ক প্রধান পরামর্শদাতা Sir John Sargent-এর নামানুসারে এই রিপোর্টকে সাধারণতঃ 'সার্জেণ্ট রিপোর্ট' বলা হইয়া থাকে। এই কমিটি সুপারিশ করিয়াছিলেন যে, ছয় হইতে চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত সমস্ত বালক-বালিকার জন্য আবশ্যিক অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভবিষ্যৎ নাগরিকদের বেশীর ভাগের শিক্ষা শেষ হইবে চৌদ্দ বৎসর বয়সে উত্তর বুনিয়াদী (Senior Basic) বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে (Middle School) শিক্ষালাভ করার পর। এই কমিটি ইহাও সুপারিশ করিয়াছিলেন যে, মাধ্যমিক স্তরে অর্থাৎ এগার হইতে চৌদ্দ বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য বহুমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। মাধ্যমিক স্তরের বিভিন্ন বিভাগের পাঠ্য-সূচী প্রধানতঃ সংস্কৃতি-মূলক হইলেও ইহা দ্বারা ছাত্রদের শিল্প, বাণিজ্য বা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের জন্য তৈয়ারি করিবে। উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষা এগার বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া ছয় বৎসরব্যাপী চলিবে ; সাধারণ ও কারিগরী—এই দুই প্রকার উচ্চ বিদ্যালয়ে শিশুদের সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে।—কেবল শেষের দিকে শিশুরা জীবনে যে বৃত্তি অবলম্বন করিবে, তাহার জন্য তৈয়ারি করা হইবে।

কেন্দ্রীয় শিক্ষোপদেষ্টা বোর্ড (Central Advisory Board of Education)-এর সুপারিশ ঃ

কেন্দ্রীয় শিক্ষোপদেষ্টা সমিতি ১৯৪৮ সালে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সমিতি সিদ্ধান্ত করেন যে, ভারত সরকারের একটি কমিশন নিয়োগ করা উচিত। এই কমিশনের কাজ হইবে—

(১) প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষার অবস্থা পর্যালোচনা করা।

(২) মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করিবার উপায় নির্ধারণ করা।

১৯৪৮ সালের সর্ব-ভারতীয় শিক্ষা-সম্মেলনে উপদেষ্টা সমিতির পূর্বোক্ত সুপারিশ অনুমোদিত হয়। তৎকালীন শিক্ষোপদেষ্টা ডাঃ তারাচাঁদের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে কতকগুলি সুপারিশ করেন। ১৯৪৯ সালে এলাহাবাদে কেন্দ্রীয় শিক্ষোপদেষ্টা সমিতির সভায় স্থির হয় যে, মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য এবং বুনিয়াদী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার একটি কমিশন নিয়োগ করা উচিত। ১৯৫১ সালে জানুয়ারি মাসে শিক্ষোপদেষ্টা সমিতির মিটিং-এ শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করিবার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়।

১৯৪৮ সালের বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (University Education Commission of 1948) ঃ

কেন্দ্রীয় শিক্ষোপদেষ্টা সমিতি ও আন্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী ড ঃরাধাকৃষ্ণানের সভাপতিত্বে একটি বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন নিয়োগ করা হয়। এই কমিশনের কাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে পর্যালোচনা করা, কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষার সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়া মাধ্যমিক শিক্ষা বিষয়ে কতকগুলি সুপারিশ করিয়াছেন। এই কমিশনের মতে বারো বৎসর মাধ্যমিক

বিদ্যালয়ে ও মাধ্যমিক কলেজে (Intermediate College) পাঠ শেষ করার পর ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে। কমিশন মনে করেন যে, সরকার বা জনসাধারণ Intermediate College-এর সত্যকার উপকারিতা উপলব্ধি করেন নাই এবং আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় মাধ্যমিক শিক্ষাই সর্বাপেক্ষা দুর্বলতম অংশ। ইহার সংস্কার একান্ত প্রয়োজনীয়।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতি-বিধান করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। যদি হাণ্টার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কাজ হইত, তাহা হইলে আজ বহুমুখী শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন করার কথা এবং মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত করিয়া ছাত্রদের গড়িয়া তুলিবার কথা আজ নূতন করিয়া বলার প্রয়োজন হইত না।

তৃতীয় অধ্যায়

ভারতে বর্তমান চল্‌তি শিক্ষা-ব্যবস্থা

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের চল্‌তি শিক্ষ-ব্যবস্থা পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে সাদৃশ্য নাই। একই স্তরের শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যেও প্রত্যেক প্রদেশে সাদৃশ্য নাই।

প্রাথমিক শিক্ষার পূর্বাবস্থা ঃ

কয়েকটি রাজ্যে বিভিন্ন প্রকারের শিশু-বিদ্যালয় (Nursery School) আছে বটে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা যথেষ্ট নহে। এই স্তরে শিশুদের পরস্পরের সাহায্য ও আনন্দপূর্ণ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করা হয় ; তাহা ছাড়া এখানে শিশু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী কতকগুলি সু-অভ্যাস এবং ভবিষ্যৎ জীবনে প্রয়োজনীয় সামাজিক আচার-ব্যবহার বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে পারে। কতকগুলি রাজ্যে নার্শারী স্কুল পরিচালনা করিতেছেন বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান বা খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকগণ (Missionaries)। কিন্তু নার্শারী স্কুল পরিচালনা করিবার খরচ ও শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের অভাবের জন্য ঐ স্কুলের সংখ্যা সীমাবদ্ধ। নার্শারী স্কুলে সাধারণতঃ তিন হইতে পাঁচ বৎসরের ছেলেদের ভর্তি করা হয় এবং সাত বৎসর বয়স পর্যন্ত রাখা হয়।

প্রাথমিক ও উত্তর-প্রাথমিক স্তর ঃ

প্রাথমিক শিক্ষা ছয় বা সাত বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া দশ-এগার বৎসর বয়স পর্যন্ত চলে। কোন রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হয় চারি বৎসর, আবার কোন কোন রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষা চলে পাঁচ

বৎসরব্যাপী। প্রায় সকলরাজ্যেই এখন পাঁচটি শ্রেণীযুক্ত নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনুপাতে নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সংখ্যা খুবই কম।

উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় (Higher Elementary School) :

ভারতের কয়েকটি রাজ্যে উচ্চ প্রাথমিক বা মাতৃভাষা-মাধ্যম মাধ্যমিক (Vernacular Middle School) আছে। এই সকল বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা ছাড়া আর কোন ভাষা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা নাই এবং সকল বিষয়ই মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়া আরও তিন বৎসর পড়ে। কিন্তু এই প্রকার বিদ্যালয়ের সংখ্যা দিন দিন কমিয়া যাইতেছে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয় :

মাধ্যমিক স্তরে বিদ্যালয়গুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—নিম্ন ও উচ্চ। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নিম্ন স্তর Middle School, Lower Secondary School, অথবা Senior Basic School—এই বিভিন্ন নামে পরিচিত। এই স্তরে তিন-চারি বৎসর শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে—অবশ্য ভারতের প্রত্যেক রাজ্যেই এই শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ একরকম নহে।

উচ্চ বিদ্যালয়কে (High School) মাধ্যমিক শিক্ষার উচ্চ স্তর বলা যাইতে পারে। বেশীর ভাগ রাজ্যেই এই সকল বিদ্যালয়ে তিন বৎসর শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। অল্প কয়েকটি রাজ্যে নিম্ন-মাধ্যমিক (Middle School) বিদ্যালয়ে চারি বৎসর এবং উচ্চ বিদ্যালয়ে (High School) দুই বৎসর শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে।

উন্নত মাধ্যমিক বিদ্যালয় (Higher Secondary School) :

উন্নত মাধ্যমিক বিদ্যালয় নূতন শিক্ষা-নিকেতন। এখানে তিন অথবা চারি বৎসরের পাঠের ব্যবস্থা আছে। High School-এ যে কয়

বৎসরের course আছে, তাহারই উপর Higher Secondary School Course-এর সময় নির্ভর করে। Intermediate Class-এর একটি বৎসর Secondary School-এ যুক্ত করা হয়।

উচ্চ শিক্ষা (Higher Education) :

মাধ্যমিক শিক্ষার সহিত উচ্চ কলেজীয় শিক্ষা ওতপ্রোতভাবে যুক্ত; তাই মাধ্যমিক শিক্ষার কথা চিন্তা করিতে গেলেই উচ্চ শিক্ষার কথাও চিন্তা করিতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে ডিগ্রী পাওয়ার জন্য চারি বৎসর পড়িতে হয়—দুই বৎসর Intermediate Class-এ এবং দুই বৎসর Degree Class-এ। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু Intermediate Class উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং Higher Secondary School-এর পর তিন বৎসরের Degree Course প্রবর্তন করা হইয়াছে। মহীশূর ও ত্রিবাঙ্কুর বিশ্ববিদ্যালয়েও তিন বৎসরের Degree Course প্রবর্তন করা হইয়াছে। কিন্তু দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ হইতে সহযোগিতা না পাওয়ার ফলে তিন বৎসরের Degree Course দেশের সর্বত্র প্রবর্তন করা সম্ভব হয় নাই।

মাধ্যমিক কলেজ (Intermediate College) :

স্যাডলার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করিয়া উত্তর ভারতে, Intermediate College স্থাপন করিবার উৎসাহ দেখা যায়। এই কলেজগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে না আসিয়া মাধ্যমিক শিক্ষা-পর্ষতের কর্তৃত্বাধীনে থাকে। অন্যান্য জায়গায় Degree Course-কে Intermediate ও Degree Class-এ বিভাগ করা হইয়াছে। বেশীর ভাগ কলেজেই চারি বৎসরের ডিগ্রী ক্লাস আছে, কিন্তু কিছুদিন হইতে কলেজীয় শিক্ষা পাইবার জন্য ছাত্রদের ভিড় হওয়ায় কতকগুলি মাধ্যমিক কলেজ খোলা হইয়াছে।

বৃত্তিমূলক কলেজ (Professional College) :

Engineering, Technology, Medicine, Vaternary, Science, Agriculture, Commerce প্রভৃতি বিষয়ের জন্য কতকগুলি কলেজ আছে। Intermediate পরীক্ষায় পাস করিয়া এখানে ভর্তি হইতে হয়।

কারিগরী বিদ্যালয় (Technical Institutes) :

বারো বৎসর বা তাহার উর্ধ্ববয়স্ক ছেলেদের জন্য কতকগুলি ব্যবসায় ও কারিগরী বিদ্যালয় আছে। এখান হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ছেলেরা ব্যবসায়-বাণিজ্য বা কোন স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করে।

Polytechnics :

বিভিন্ন রাজ্যে কতকগুলি কারিগরী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে—এই সকল শিক্ষায়তনের পাঠ্যক্রম ও ব্যাপকতা সব সময় একরকম নহে।

কোন কোন রাজ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ের শেষের দিকে কৃষি, কারিগরী, চারু ও হস্তশিল্প, অফিসের কাজ, গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান প্রভৃতি বহুমুখী পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে শিক্ষা-প্রণালী ও শিক্ষায়তনের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়।

———

চতুর্থ অধ্যায়

শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ

বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার দোষ-ত্রুটি ঃ

বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রধান দোষ হইতেছে যে, ইহা একঘেয়ে ও পুঁথিপ্রধান। বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহশীল শিশুদের উপযোগী বিভিন্ন প্রকার পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা ইহাতে নাই। নিয়মানুবর্তিতা, সহযোগিতা, নেতৃত্ব প্রভৃতি যে-সব গুণ থাকিলে যুবকেরা সুনাগরিক হইতে পারে, সে-সকল গুণ-বিকাশের বিশেষ কোন সুযোগ বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় দেওয়া হয় না। পরীক্ষার ফলে, গুরু পাঠ্যক্রম, নীরস পাঠদান-পদ্ধতি, কোনরূপ আনন্দময় পরিবেশের অভাব—এই সবগুলি মিলিয়া বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট নিরানন্দময় করিয়া তুলিয়াছে। ছাত্রদের শিশু-বিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তুত করার একমুখী লক্ষ্য দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ফলে ছাত্র বা শিক্ষক কাহারও অন্তর্নিহিত গুণাবলী বিকাশের সুযোগ মিলে না। বহুমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকার ফলে বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া অনেক ছেলের পক্ষে কোন উপযুক্ত কাজ যোগাড় করা কঠিন হয়। অনেক সময় দেখা যায়, বাঁধা-ধরা কর্মসূচী, অনুপযুক্ত ও অপকৃষ্ট পাঠ্য-পুস্তক, প্রয়োজনাতিরিক্ত দীর্ঘ পাঠ্য-সূচীর জন্য শিক্ষকেরা ছাত্রদের মধ্যে আত্মনির্ভরতা ও স্বাধীন চিন্তার সুযোগ দিতে পারেন না। প্রতি শ্রেণীতে ছাত্রসংখ্যা বেশী থাকায় শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিতে পারে না। বর্তমানে শিক্ষার বিস্তার হওয়ার ফলে এমন অনেক বাড়ীর ছেলে বিদ্যালয়েপড়িতে আসে যাহাদের বাড়ীতে শিক্ষার কোন পরিবেশ নাই। কাজেকাজেই বিদ্যালয়ে যাহা শিখে, তাহা বাড়ীতে আলোচনা করিবার কোন সুযোগ পায় না।

এই বিষয়ে বিদ্যালয়ের বিশেষ কর্তব্য থাকিলেও বর্তমান অবস্থায় তাহা পালন করা সম্ভব নহে। শিক্ষকতার জন্য উপযুক্ত গুণসম্পন্ন ও শিক্ষানুরাগী শিক্ষক পাওয়া আজকাল দুষ্কর হইয়াছে, একথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে। বহুসংখ্যক শিক্ষক আমাদের প্রয়োজন, তাই বাছিয়া বাছিয়া শিক্ষক নিয়োগ করাও সম্ভব হইতেছে না। খেলা, গান, অভিনয় প্রভৃতি পাঠ্যবহির্ভূত বিষয়গুলি ছাত্রদের শারীরিক উন্নতি-বিধান করে এবং সামাজিক জীবন-যাপনের উপযোগী কতকগুলি গুণেরও সমাবেশ হয়; কিন্তু কয়টি বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা এই সকল পাঠ্যবহির্ভূত কাজের সুযোগ পায়। আমাদের দেশের খুব কম বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ আছে যেখানে ছেলেরা দলবদ্ধভাবে খেলা করিতে বা অন্যান্য বিশুদ্ধ আমোদ-প্রমোদ করিতে পারে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে আমরা সকলেই অল্প-বিস্তর পরিচিত। সুতরাং মাধ্যমিক শিক্ষার দোষ-ত্রুটির তালিকা বৃদ্ধি করা কঠিন নয়। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার করিতে হইলে মূলগত দোষ-ত্রুটির কথাই বিচার করিতে হইবে।

প্রথমতঃ, বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহার সহিত জীবনের সম্পর্ক নাই বলিলেই হয়। মামুলী শিক্ষা-প্রণালীর মাধ্যমে বিদ্যালয়ে যে পাঠ্য-সূচী অনুকরণ করা হয়, তাহা দ্বারা ছাত্র-ছাত্রীরা জগতের সঙ্গে পরিচিত হইবার সুযোগ পায় না। বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়া যখন ছাত্র-ছাত্রীরা বাহির হয়, তখন তাহারা সহজেই সমাজের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াইতে পারে না। ইহার প্রতিকার করিতে হইলে বিদ্যালয়কেই একটি সমাজে পরিণত করিতে হইবে এবং বাহিরের সমাজ-জীবনের সহিত যোগ রাখিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা সংকীর্ণ এবং ছাত্রদের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের খুব বেশী সহায়তা করে না। বহুদিন ধরিয়া বিদ্যালয়ে

ছাত্র-ছাত্রীদের এমন সব জিনিস দেখানো হয়, যাহা পূর্ণবয়স্কেরা মনে করে তাহাদের উপযোগী হইবে অথবা যাহাতে তাহাদের লিখিবার ও পড়িবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে। শিশুর দৃষ্টিভঙ্গি, অনুভব-শক্তি, রুচি, প্রক্ষোভ প্রভৃতি যে-সব গুণ ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সহায়তা করে, সেদিকে কোন লক্ষ্যই করা হইত না। অবশ্য বর্তমানে খেলা-ধূলা, শিল্প ও সামাজিক কাজ বিদ্যালয়ের কর্মসূচীর অন্তর্গত হইয়াছে, কিন্তু তথাপি এখনও এগুলিকে পাঠ্য-সূচীর অঙ্গ বলিয়া গণ্য করা হয় না। এক কথায় বলা যাইতে পারে যে, বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় ছাত্রদের ব্যক্তিত্বের আংশিক বিকাশ হয়।

তৃতীয়তঃ, অল্পকাল আগে পর্যন্ত ইংরাজী ভাষা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আবশ্যিকভাবে পড়ানো হইত এবং ইহা শিক্ষার মাধ্যমও ছিল। যে সকল ছাত্র-ছাত্রীর ভাষা-শিক্ষার ক্ষমতা কম, তাহারা মাধ্যমিক শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ লাভ করিতে পারিত না। ইংরাজী ভাষা ভাল করিয়া শিখিতে না পারিলে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করিতে পারিত না। ফলে তাহারা কোন সরকারী চাকুরিও পাইত না। মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক দিক হইতে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিতে বেশী জোর দিবার কোন ব্যবস্থা ছিল না।

চতুর্থতঃ, যে পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হইত, তাহাতে ছাত্রদের স্বাধীন চিন্তা ও নিজে দায়িত্ব লইয়া কাজ করিবার কোন সুযোগ দেওয়া হয় না। সহযোগিতার পরিবর্তে প্রতিযোগিতার উপরই বেশী জোর দেওয়া হয়। প্রায় সকলেই অভিযোগ করেন যে, শিক্ষক মহাশয়েরা যে তথ্য পরিবেশন করেন তাহা মুখস্থ করিতে ছাত্রদের বাধ্য করা হয়।

পঞ্চমতঃ, শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যা বেশী থাকার জন্য শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপিত হয় না। ইহার জন্য শিশুদের চরিত্র-গঠন ও নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষার সুবিধা হয় না। তাহা ছাড়া, আগেকার

দিনের শিক্ষকের চেয়ে বর্তমানে শিক্ষকের কার্য-ক্ষমতা কমিয়াছে বলিয়া মনে হয়; অর্থাভাব ও সামাজিক মর্যাদার অভাবে শিক্ষকদের মনে পরাজিতের মনোভাব দেখা দিয়াছে। শিক্ষকের দ্বারা কাজ পাইতে হইলে শিক্ষকদের সন্তোষ-বিধানের জন্য কিছু করা কর্তব্য।

বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় দোষ হইতেছে পরীক্ষা পাসের উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া। ইহার জন্য শিক্ষকেরা স্বাধীন-ভাবে কোন কাজ করিতে পারেন না; পাঠ্যক্রমে কোন বৈচিত্র্য থাকে না, পড়াইবার পদ্ধতি হয় একঘেয়ে, আর গবেষণা করিবার কোন সুযোগও থাকে না।

মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ঃ

শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য সম্বন্ধে অনেক শিক্ষাবিদ্ নানা মত ব্যক্ত করিয়াছেন। সেই সব মত সম্বন্ধে আলোচনা না করিয়া আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় শিক্ষার লক্ষ্য কি হওয়া উচিত, তাহাই দেখা যাউক। দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে লক্ষ্য কি হইবে, তাহা নূতন করিয়া ভাবিয়া দেখা উচিত। শুধু বর্তমান অবস্থাই নহে, ভবিষ্যৎ সমাজ-ব্যবস্থা কিরূপ হইবে, সেদিকেও লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষার উদ্দেশ্য ঠিক করিতে হইবে।

গণতান্ত্রিক ভারতে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ঃ

অল্প দিন হইল, ভারত স্বাধীন হইয়াছে এবং ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অতএব ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থার লক্ষ্য হইবে, দেশের ছেলেমেয়ের চরিত্র এমনভাবে গঠন করা উচিত যাহাতে তাহারা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে উপযুক্ত নাগরিক হইতে পারে। যদিও ভারতবর্ষে প্রাকৃতিক সম্পদ্ যথেষ্ট আছে, তথাপি ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশ এবং ভারতবাসীর জীবন-যাত্রার মান অন্য দেশের তুলনায়

অনেক নীচে। অতএব একটি বড় সমস্যা হইতেছে, ভারতের উৎপাদন-শক্তি উৎপাদন করিয়া সম্পদ্ বৃদ্ধি করা এবং দেশের লোকের জীবন-যাত্রার মান উন্নত করা। তাহা ছাড়া দেশে দরিদ্রের সংখ্যা এত বেশী যে, এদেশবাসীরা কোন রকমে জীবিকা অর্জনের জন্য ব্যগ্র থাকায় শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে লক্ষ্য করিতে পারে না। অতএব আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার এমনভাবে সংস্কার করিতে হইবে, যাহাতে ভারতের পুরাতন সংস্কৃতিও পুনর্জীবিত হইতে পারে।

গণতন্ত্রে নাগরিক তৈয়ারি করিবার কাজে শিক্ষার অবদান ঃ

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উপযুক্ত নাগরিক হইতে হইলে শিক্ষার প্রয়োজন। সুনাগরিক হইতে হইলে যে সকল গুণের প্রয়োজন, তাহা আপনা হইতে অর্জন করা যায় না। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে অংশ গ্রহণ করিতে হইলে, প্রত্যেক নাগরিককে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার শক্তি অর্জন করিতে হইবে। মাধ্যমিক শিক্ষাকেই সাধারণ শিক্ষার শেষ ধাপ বলা যাইতে পারে। অতএব এই স্তরেই বালক-বালিকাদের সুনাগরিক হইবার শিক্ষা দিতে হইবে। নূতন ভাবধারা গ্রহণ করিবার শক্তিই নাগরিকের সর্বাগ্রে প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে ছাত্রদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার শক্তি-বিকাশের দিকে বিশেষ লক্ষ্য করা উচিত। নাগরিকদের স্বাধীনভাবে যথাযথ চিন্তা করিবার ক্ষমতা না থাকিলে তাহারা প্রচারকদের দ্বারা কুপথে চালিত হইতে পারে। যখন প্রচারকেরা কোন যুক্তির অবতারণা করিবে, তখন তাহার মধ্যে কতটা সত্য আছে তাহা বিচার করিবার শক্তি নাগরিকের থাকা প্রয়োজন। পুরাতন রীতি-নীতি ও ভাবধারার মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া নূতন ভাবধারা গ্রহণের জন্য মনের দরজা উন্মুক্ত রাখিতে হইবে। যাহা-কিছু পুরাতন তাহাই খারাপ এবং যাহা-কিছু নূতন তাহাই ভাল, এইরূপ মনোভাব পরিত্যাগ করিয়া যাহা ন্যায়

ও যুক্তিসঙ্গত পন্থা তাহাই গ্রহণ করিবার শিক্ষা করিতে হইবে। আমাদের দেশে এখন এমন শিক্ষকের প্রয়োজন যাঁহারা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এই প্রকার মনোভাব সৃষ্টি করিবার অনুকূল শিক্ষা-পদ্ধতি গ্রহণ করিতে পারিবেন। মামুলী পদ্ধতিতে শিক্ষকেরা শ্রেণীকক্ষে বক্তৃতা দেন এবং ছাত্রেরা চুপচাপ শুনিয়া যায়। এই প্রথার পরিবর্তন না করিলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উপযুক্ত নাগরিক তৈয়ারি করা সম্ভব হইবে না।

স্বচ্ছ চিন্তাধারার সহিত স্পষ্ট করিয়া কথা বলা ও লেখার অভ্যাসও প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বল-প্রয়োগের স্থান নাই; ভাবের বিনিময় যুক্তি-প্রদর্শন ও আলোচনার দ্বারা কার্য সিদ্ধ করিতে হইবে। নিজের প্রভাব অপরের উপর জাহির করিতে হইলে এবং গণ-চেতনা জাগাইয়া তুলিতে হইলে, কথা ও লেখার মাধ্যমে নিজের মনের ভাব স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিবার ক্ষমতা থাকা নাগরিকের একান্ত প্রয়োজন।

প্রত্যেক মানুষকে উপযুক্ত মর্যাদা দান করা গণতন্ত্রের একটি মূলনীতি। অর্থ, সমাজ ও বংশ-গৌরবের দ্বারাই কাহারও যোগ্যতার বিচার করা উচিত নহে। প্রত্যেক নাগরিকের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ-সাধনের সুযোগ দেওয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একান্ত প্রয়োজন। সমাজে বাঁচিয়া থাকিবার পন্থা দেখানো শিক্ষার একটি প্রধান উদ্দেশ্য। মানুষ সমাজবদ্ধভাবে ভিন্ন একা একা থাকিতে পারে না। নিজের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ এবং সমাজের কল্যাণের জন্য মানুষকে অপরের সহিত বাস করিবার এবং বিভিন্ন কাজে সহযোগিতার ক্ষমতা অর্জন করিতে হইবে। যে শিক্ষা মানুষকে অপরের সঙ্গে সামঞ্জস্য ও সহযোগিতার সহিত বাস করিতে সাহায্য করে না, তাহাকে প্রকৃত শিক্ষা বলা যায় না। নিয়মানুবর্তিতা, সহযোগিতা, অনুভব-শক্তি এবং পরমত-সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণগুলি সমাজে বসবাস করিবার জন্য একান্ত প্রয়োজন। নিয়মানুবর্তিতা ছাড়া কখন কোন দলবদ্ধ কাজ ভালভাবে করা যায়

না। কিন্তু আজকাল নিয়মানুবর্তিতার মান অনেক নীচে নামিয়া গিয়াছে। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তাহা শিক্ষকদের সর্বাগ্রে দেখা উচিত।

ছাত্রদের মনে যাহাতে সহযোগিতার স্পৃহা জাগে এবং কর্মক্ষেত্রে যাহাতে তাহারা অপরের সহিত সহযোগিতা করিতে পারে, বিদ্যালয়কে সে সুযোগ দিতে হইবে। সমাজের অকল্যাণ দূর করিয়া সামাজিক ন্যায়নিষ্ঠার প্রতি আগ্রহ জাগাইবার বিদ্যালয়ই উপযুক্ত স্থান।

পরমত-সহিষ্ণুতাকে গণতন্ত্রের স্তম্ভ বলা যাইতে পারে। গণতান্ত্রিক সমাজের শুধু পরমত-সহিষ্ণুতাই যথেষ্ট নহে, পরন্তু বিভিন্ন মত আহ্বান করিয়া তাহার সমালোচনা দরকার। আমাদের দেশে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী, বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন সমাজের লোক বাস করে। সমাজের বিভিন্ন লোকের ভাব, ভাষা ও ধর্মের সামঞ্জস্য-বিধান কিরূপে করিতে হইবে, তাহাই আমাদের ছাত্রদের শিখাইতে হইবে। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও সমাজের ছেলেমেয়ে সমবেত হয়। যদি ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ের এই ক্ষুদ্র সমাজে সুখে ও শান্তিতে থাকিতে শিখে, তাহা হইলে বৃহত্তর সমাজে ও বিভিন্ন মতাবলম্বী লোকের সহিত শান্তি ও সদ্ভাব রক্ষা করিয়া বাস করা তাহাদের পক্ষে কঠিন হইবে না।

ছাত্রদের মনে সত্যকার দেশাত্মবোধ জাগানো মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান কর্তব্য। দেশাত্মবোধ বলিতে তিনটি জিনিস বুঝায় —(১) নিজের দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ করিতে হইবে। (২) দেশের দোষ-ত্রুটি নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করিয়া নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ বলি দিয়া দেশের উন্নতির জন্য সচেষ্ট থাকিতে হইবে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা কথা সর্বদা মনে রাখিতে হইবে, "ভাল মন্দ যাহাই হউক না কেন, আমার দেশকে অনুকরণ করিব"—এইরূপ মনোভাবকে প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিকতা বলা যাইতে পারে না। (৩) সকল

লোকই পৃথিবীর অধিবাসী এবং সকলকে মিলিতভাবে বর্তমান জগতের উন্নতি-বিধান করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এই মনোভাব বিদ্যালয়ের শিশুদের মনে জাগাইয়া তুলিতে হইবে।

বৃত্তিমূলক যোগ্যতা-বৃদ্ধি ঃ

বর্তমানে আমাদের দেশের যুবকদের উৎপাদনমূলক ও বৃত্তিমূলক কার্যে যোগ্যতা-বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য দেওয়া উচিত। ছাত্রদের মনে কার্যের প্রতি মর্যাদা-বোধ জাগাইতে হইবে, যাহাতে তাহারা মনে করিতে পারে কোনকাজই অমর্যাদাকর নহে এবং যে কাজেই তাহারা হাত দিবে তাহা নিখুঁতভাবে করা উচিত। এতদিন পর্যন্ত আমাদের দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থায় পুঁথিগত ও অপ্রাকৃত কল্পনামূলক বিষয়ে জোর দেওয়া হইয়াছে; তাহাতে আমাদের শিক্ষিত যুবকেরা দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ্ ও সমৃদ্ধি-বৃদ্ধির কাজে যথাযথ অংশ গ্রহণ করিতে পারে নাই। এই অবস্থা যাহাতে পরিবর্তিত হয় তাহার জন্য মুদালিয়ার কমিশন প্রত্যেক বিদ্যালয়ে শিল্প ও অন্যান্য উৎপাদনমূলক কার্য প্রবর্তন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঃ

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আর একটি লক্ষ্য হওয়া উচিত, ছাত্র-ছাত্রীদের অন্তর্নিহিত সৃজনী-শক্তি বিকাশের এমন সুযোগ দেওয়া যাহাতে তাহারা আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া অবসর সময়ে নিজ নিজ অনুরাগ অনুযায়ী সুকুমার বৃত্তির অনুশীলন করিতে পারে। এতদিন পর্যন্ত আমাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের সৃজনী-শক্তিকে চারু-শিল্প-প্রীতি, প্রক্ষোভ-জীবন ও সামাজিক জীবন বিকাশের কোন সুযোগ দেওয়া হয় নাই। সেইজন্য প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, স্কুল-কলেজের শিক্ষা শেষ করিয়া ছেলেমেয়েরা যখন বাহির হইয়া আসে, তখন অবসর বিনোদনের মত

কোন পাথেয়ই তাহাদের থাকে না বলা যাইতে পারে। তাই মুদালিয়ার কমিশন প্রস্তাব করিয়াছেন যে, বিদ্যালয়ের কার্যক্রমের মধ্যে শিল্প, কলা, সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদি অনুসরণের সুযোগ দিতে হইবে।

নেতৃত্ব-গ্রহণের শিক্ষা ঃ

মাধ্যমিক শিক্ষা প্রাথমিক স্তরে প্রদত্ত শিক্ষার ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিবে ; অতএব বুনিয়াদী শিক্ষার সহিত এরূপ যোগ থাকা দরকার, যাহাতে কর্মকেন্দ্রিক বুনিয়াদী বিদ্যালয় হইতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া শিশু যেন মনে না করে, একটা অপরিচিত পরিবেশের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে।

প্রথমতঃ, মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও উৎপাদনমূলক কার্য, সমাজ ও পরিবেশের সঙ্গে যোগ-স্থাপনের ব্যবস্থাও থাকা উচিত।

দ্বিতীয়তঃ, যেহেতু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠ শেষ করিয়া অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারে, সেইজন্য এখানে ছাত্রদের এমন জ্ঞান দান করিতে হইবে এবং এমন কতকগুলি অভ্যাস-গঠনের সুযোগ দিতে হইবে, যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়া তাহারা নিজেদের মানাইয়া লইতে পারে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, বহু ছাত্রের শিক্ষা-জীবন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠের সঙ্গেই শেষ হইবে। কাজেই মাধ্যমিক শিক্ষাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে হইবে। মাধ্যমিক বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া যাহারা কোন সাধারণ বা কারিগরী শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে না, তাহারা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাহাতে নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে পারে, সে বিষয়ে শিক্ষা দিতে হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

মাধ্যমিক শিক্ষার রূপ

(১) মাধ্যমিক শিক্ষার পরিবর্তিত রূপ :

মাধ্যমিক শিক্ষা স্বয়ংসম্পূর্ণ। মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে প্রয়োজন হইলে ছাত্র-ছাত্রীরা জীবনে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে যাহাতে প্রবেশ করিতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। একটি ছাত্র কত বৎসর বয়সে মাধ্যমিক শিক্ষা আরম্ভ করিবে এবং কত বৎসর বয়সে মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করিবে, তাহা স্থির করা দরকার। সকল শিক্ষাবিদ্ই স্বীকার করেন যে, এখন যে-সব ছাত্র-ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে বা অন্য কোন প্রকার উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য অগ্রসর হয়, তাহাদের শিক্ষার মান খুব উচ্চ নহে এবং উচ্চশিক্ষা-লাভের উপযুক্ত বয়সও তাহাদের হয় না। আরও কিছুদিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিলে তাহারা অধিকতর যোগ্যতা লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারিবে এবং যাহারা এইখানেই পড়া শেষ করিবে, তাহারাও অধিকতর যোগ্যতা লইয়া জীবন-যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে পারিবে।

এই সম্বন্ধে Sadlar Commission-এর বক্তব্য :

বর্তমান প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করিয়া ছাত্রেরা যে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে, ইহা বন্ধ হওয়া দরকার। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ছাত্রেরা যে শিক্ষা লাভ করে, তাহা তাহাদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযুক্ত করিতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের মান বাড়াইলেই এই সমস্যার সমাধান হইবে না। Intermediate College-এ দুই বৎসর ছাত্রেরা যাহা শিখে তাহার সমতুল্য শিক্ষা মাধ্যমিক স্তরে দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে High School এর পরে দুই বৎসর শিক্ষার জন্য কতকগুলি শিক্ষা-নিকেতন খুলিতে

হইবে। ছাত্রদের যোগ্যতা ও অনুরাগ অনুযায়ী ব্যবসায়, কৃষি, বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন শিক্ষাধারার ব্যবস্থা এই সকল স্থানে করা হইবে। বর্তমান উচ্চ বিদ্যালয়ের শেষে একটি পরীক্ষা হইবে এবং এই পরীক্ষার পর যোগ্যতা ও রুচি অনুসারে ছাত্র-ছাত্রীদের ঐ দিকে দুই বৎসরের বিভিন্ন ধারা-সম্বলিত উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অনেকে High-School-এ শিক্ষা শেষ করিয়া আর পড়িবে না ; সেইজন্য High School Certificate তাহাদের কাজে লাগিবে এবং যাহারা Higher Secondary School-এ ভর্তি হইবে ঐগুলি তাহাদের প্রবেশ-পত্রেরও কাজ করিবে।

Mudaliar Commission-এর মত :

এই সম্বন্ধে Mudaliar Commission বলেন যে, বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষার কাল এক বৎসর বাড়াইয়া দিতে হইবে এবং নিম্ন-মধ্য বিদ্যালয় (Middle School) বা উচ্চ-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পর চারি বৎসরব্যাপী শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু এই সঙ্গে এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, উচ্চশিক্ষার জন্য এখন যে সময় নির্ধারিত আছে তাহা বাড়ানো চলিবে না। কারণ, তাহাতে ছাত্রদের ও কর্তৃপক্ষের ব্যয় বাড়িয়া যাইবে। কাজেই মধ্য-কলেজীয় স্তর (Intermediate Stage) উঠাইয়া দিয়া মাধ্যমিক শিক্ষার কাল এক বৎসর বাড়াইতে হইবে এবং কলেজে তিন বৎসরের Degree Course-এর প্রবর্তন করিতে হইবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা এগার বৎসর হইতে সতের বৎসর পর্যন্ত করিতে হইলে এই সম্বন্ধে একটি কথা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। বর্তমানে সরকার ছয় হইতে এগার বৎসর বয়স পর্যন্ত সকল বালক-বালিকার জন্য নিম্ন-বুনিয়াদী শিক্ষা আবশ্যিকভাবে প্রবর্তন করিবেন স্থির করিয়াছেন। কাজেই মনে হইতে পারে, প্রস্তাবিত মাধ্যমিক শিক্ষা-

ব্যবস্থার সহিত বুনিয়াদী শিক্ষার সংঘর্ষ হইতে পারে। Zakir Hussain Committee এবং Central Advisory Board of Education বুনিয়াদী শিক্ষার যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন, বর্তমান প্রাথমিক ও চলতি মাধ্যমিক শিক্ষার কিয়ৎ অংশ তাহার অন্তর্গত। উচ্চ-বুনিয়াদী স্তরকে মাধ্যমিক শিক্ষার অংশ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। বুনিয়াদী শিক্ষার সহিত যাহাতে কোন সংঘর্ষ না হয়, সেইজন্য Mudaliar Commission সুপারিশ করিয়াছেন যে, Senior Basic Middle এবং Lower High School-এর পাঠ্যক্রম মোটামুটি একই রকম হইবে। দেশে এখনও Senior Basic School-এর সংখ্যা খুবই কম এবং সমস্ত Middle ও Lower Secondary School-কে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পরিবর্তন করিতে বহুদিন লাগিবে। সেইজন্য কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন যে, সাধারণ বিদ্যালয়ে বুনিয়াদী শিক্ষার মূল নীতিগুলি যতদূর সম্ভব প্রবর্তন করা উচিত।

Sadlar Commission-এর মতে শিক্ষার কাঠামো নিম্নপ্রকার হইবে :—

(১) প্রাথমিক অথবা নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয়—ছয় বৎসর হইতে এগার বৎসর।

(২) Middle High School, Junior Secondary School অথবা Senior Basic School—এগার হইতে চৌদ্দ বৎসর।

(৩) Higher Secondary School—চৌদ্দ বৎসর হইতে সতের বৎসর।

Secondary Education Commission, West Bengal বা Dey Commission :

Dey Commission এ বিষয়ে যে সুপারিশ করিয়াছেন, তাহা Mudaliar Commission-এর অনুরূপ। Dey Commission

বলিয়াছেন যে, বারো বৎসরের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামো নিম্নপ্রকার হইবে :—

(১) প্রাথমিক শিক্ষা—পাঁচ বৎসর।

(২) Middle School, Junior Secondary অথবা Senior Basic School—তিন বৎসর (Classes VI—VIII)।

(৩) Higher Secondary School (Classes IX—XI)—বর্তমান Intermediate College-এর দুই বৎসর High School-এর অন্তর্ভুক্ত হইবে।

ভারতের সংবিধান অনুযায়ী ছয় হইতে চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত চলিবে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীর জন্য একই ধারায় শিক্ষা ; তাহার পর চারি বৎসর ছাত্রদের ক্ষমতা, রুচি ও যোগ্যতা অনুযায়ী বহুমুখী শিক্ষাধারার ব্যবস্থা থাকিবে।

(২) অন্তর্বর্তী অবস্থা (Transitional Stage) :

বর্তমান দশম শ্রেণীযুক্ত High School-এর সঙ্গে Intermediate College-এর একটি শ্রেণী যোগ করিয়া একাদশ শ্রেণীযুক্ত Higher Secondary School স্থাপন করার যৌক্তিকতা Sadlar Commission হইতে আরম্ভ করিয়া Dey Commission পর্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন।

কিন্তু দেশের সমস্ত দশম শ্রেণীযুক্ত High School-কে রাতারাতি Higher Secondary School-এ পরিবর্তন করা সম্ভব নহে। উপযুক্ত শিক্ষক, উন্নত শিক্ষোপকরণ, বৃহত্তর বিদ্যালয়-গৃহ প্রভৃতি অভাব মিটাইতে সময় লাগিবে। অন্তর্বর্তীকালের জন্য কি করা উচিত ?

Mudaliar Commission বলেন :

সমস্ত উচ্চ বিদ্যালয়গুলির পক্ষে এমনই একটি শ্রেণী যোগ করিয়া Higher Secondary বা Multipurpose School-এ পরিবর্তিত

হওয়া সম্ভবপর নহে। অতএব কিছুদিন দুই রকম উচ্চ বিদ্যালয়ই চলিতে থাকিবে—বর্তমান দশম শ্রেণীযুক্ত বিদ্যালয় এবং একাদশ শ্রেণীযুক্ত Higher Secondary বা Multipurpose School. দশম শ্রেণীযুক্ত বিদ্যালয়গুলি ইতিমধ্যে এরূপ উন্নতি-বিধান করিতে থাকিবে যাহাতে যত শীঘ্র সম্ভব এগুলি Higher Secondary School-এ পরিবর্তিত হইতে পারে। বর্তমান High School-কে Higher Secondary School-এ পরিবর্তিত করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়ে উন্নতি-বিধান করিবার চেষ্টা করিতে হইবে :—

(১) স্থান বা পরিসর।

(২) শিক্ষোপকরণ।

(৩) শিক্ষকদের যোগ্যতা।

(৪) শিক্ষকদের বেতনের হার।

(৫) বিদ্যালয় ভালভাবে চালাইবার জন্য উপযুক্ত অর্থ।

Dey Commission-এর সুপারিশ :

বর্তমানে দশম শ্রেণীযুক্ত উচ্চ বিদ্যালয় ও একাদশ শ্রেণীযুক্ত Higher Secondary School-ই চলিতে থাকিবে; একাদশ শ্রেণীর শেষে সরকার বা মাধ্যমিক শিক্ষা-পর্ষৎ কর্তৃক পরিচালিত একটি পরীক্ষা লওয়া হইবে। যে সকল ছাত্র-ছাত্রী দশম শ্রেণীযুক্ত বিদ্যালয়ে পাঠ শেষ করিয়া আর পড়িবে না, তাহাদিগকে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা করিয়া দশম শ্রেণী হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছে এইরূপ certificate দিবেন। Certificate-এর ফলে তাহারা সরকারী চাকুরি করিতে বা Polytechnic School-এও পড়িতে পাইবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ঘোষণা :

শিক্ষক সমিতি এবং জনসাধারণের অনেকের মধ্যে একটা সংশয় হইয়াছিল, যে সকল উচ্চ বিদ্যালয় একাদশ শ্রেণীযুক্ত Multipurpose

School বা Higher Secondary School-এ পরিবর্তিত হইবে না, তাহাদিগকে অবনত করিয়া অষ্টম শ্রেণীযুক্ত Junior High School-এ পরিবর্তিত করা হইবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার জনসাধারণের এই সংশয় দূর করিবার জন্য ঘোষণা করিয়াছেন যে, কোন দশম শ্রেণীযুক্ত উচ্চ বিদ্যালয়কে Junior High School-এ অবনত করা হইবে না। উভয় প্রকার উচ্চ বিদ্যালয় চলিতে থাকিবে। দশম শ্রেণী ও একাদশ শ্রেণীর শেষে সাধারণভাবে পরীক্ষা লওয়া হইবে। দশম শ্রেণী হইতে পাস করিয়া কোনছাত্র একাদশ শ্রেণীযুক্ত Higher Secondary School-এ ডিগ্রী কলেজের প্রস্তুতি-শ্রেণীতে (Preparatory Class) বা কোন চাকুরিতে যোগ দিতে পারে।

(৩) **Intermediate College :**

বর্তমানে সকল ডিগ্রী কলেজেই I. A. ও B. A. পড়াইবার ব্যবস্থা আছে। বিভিন্ন কমিশন মন্তব্য করিয়াছেন, উচ্চ বিদ্যালয়ে এখন যে ধরনের শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাতে ছাত্রদিগকে কলেজের জন্যও তৈয়ারি করিতে পারে না এবং সংসারে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত পাথেয়ও দিতে পারে না। বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা সংস্কার করিবার উদ্দেশ্যে Intermediate College সম্বন্ধে বিভিন্ন মন্তব্য নিম্নে দেওয়া হইল।

Sadlar Commission প্রস্তাব করিয়াছেন যে, High School-এ শিক্ষা শেষ হইবার পরে সাধারণ কলেজে বা বৃত্তিশিক্ষা কলেজে প্রবেশ করিবার পূর্বে Intermediate College-এ দুই বৎসর পাঠ করিতে হইবে। এই Intermediate Collegeগুলি হইবে মাধ্যমিক শিক্ষার অঙ্গ। সম্ভব হইলে ভাল ভাল উচ্চ বিদ্যালয়ের সঙ্গে Intermediate College-এর দুইটি শ্রেণী যোগ করিয়া Higher Secondary School গঠন করা যাইতে পারে। তাহা সম্ভব না হইলে প্রদেশের বিভিন্ন মধ্যবর্তী স্থানে দুই বৎসরের Course-সংযুক্ত Intermediate

College স্থাপন করিতে হইবে। এই Intermediate College-গুলি দুই প্রকার উদ্দেশ্য সাধন করিবে।

প্রথমতঃ, এই কলেজে ছাত্রদের এমন শিক্ষা দেওয়া হইবে যাহাতে তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে বা উচ্চতর বৃত্তিশিক্ষা-কেন্দ্রে (Higher Technological Training) প্রবেশ করিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, Intermediate College-এ এমন শিক্ষা দেওয়া হইবে, যাহাতে ছাত্রেরা এখানে পাঠ শেষ করিয়া জীবনের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারে। এই Intermediate Collegeগুলি Board of Secondary and Intermediate Education-এর কর্তৃত্বাধীনে থাকিবে।

Mudaliar Commission এ বিষয়ে সুপারিশ করিয়াছেন যে, যখন চারি বৎসরের Higher Secondary School এবং তিন বৎসরের Degree Course চালু হইবে, তখন বর্তমান Intermediate College-এ পরিবর্তন করা প্রয়োজন হইবে। কতকগুলি Intermediate College-এর সঙ্গে High School আছে ; সেগুলি উপরের একটি শ্রেণী বাদ দিয়া সহজেই Higher Secondary School-এ রূপান্তরিত হইতে পারে। যে সমস্ত Intermediate College-এ স্থান, শিক্ষোপকরণ ও উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন অধ্যাপক এবং প্রয়োজনীয় অর্থ-সংস্থান আছে, সেই সকল Intermediate College, Degree College-এ পরিবর্তিত হইতে পারে। এখন যে সমস্ত প্রথম শ্রেণীর কলেজে দুই বৎসর I. A. ও দুই বৎসর B. A./B. Sc. পড়া হয়, সেগুলিতে তিন বৎসরের Degree Class থাকিবে এবং এক বৎসর প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয়ের Course থাকিবে। দশম শ্রেণীযুক্ত উচ্চ বিদ্যালয় হইতে পাস করিয়া ছাত্রেরা এই কলেজে ভর্তি হইতে পারিবে। অতএব দেখা যাইতেছে, কিছুদিন পর্যন্ত দশম শ্রেণীযুক্ত High School এবং

একাদশ শ্রেণীযুক্ত Higher Secondary School—এই দুই-ই থাকিবে। Higher Secondary School হইতে পাস করিয়া ছাত্রেরা তিন বৎসরের Degree Course--এর জন্য কলেজে ভর্তি হইতে পারিবে। কিন্তু যে ছাত্রেরা দশম শ্রেণীযুক্ত High School হইতে পাস করিবে, তাহারা যদি কলেজীয় শিক্ষা চায়, তাহা হইলে তাহাদিগকে প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় শ্রেণীতে এক বৎসর পড়িতে হইবে। এই শ্রেণীতে ছাত্রদের Degree Course-এ প্রবেশের জন্য প্রস্তুত করা হইবে।

International Team :

এই প্রসঙ্গে International Team কি সুপারিশ করিয়াছেন, তাহা দেখা যাউক। International Team মনে করেন যে, আমেরিকার মত আমাদের দেশে কতকগুলি Junior College থাকা উচিত। High School বা Higher Secondary School হইলে পাস করিয়া যাহারা আরও পড়াশুনা করিতে চায়, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত যাইতে রাজী নহে, কেবল তাহাদের জন্যই Junior College স্থাপিত হইবে।

Junior College একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষা-নিকেতন হিসাবে গড়িয়া উঠিতে পারে অথবা High School কিংবা Degree College-এর সঙ্গে সংযুক্ত থাকিতে পারে। বর্তমান Intermediate College-এর সঙ্গে Junior College-এর পার্থক্য হইবে এই যে, এখানে পাঠ্যক্রম বা course-এর ব্যাপ্তি সম্বন্ধে খুব কড়াকড়ি থাকিবে না। এখানকার পাঠ শেষ করিলে ছাত্রদের Associate of Art বা Associate of Science—এই ডিগ্রী দেওয়া হইবে। ইহার ফলে তাহারা বিভিন্ন বিভাগে কর্ম-সংস্থান করিয়া লইতে পারিবে।

Junior College-এর উদ্দেশ্য হইবে কারিগরী ও বৃত্তিমূলক

শিক্ষার উপর ভিত্তি করিয়া ছাত্রদের সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার ব্যবস্থা করা। যদি কোন ছাত্র Junior College-এর পাঠ শেষ করিয়া Degree College-এ ভর্তি হইতে চায়, তাহা হইলে তাহার সুযোগও দেওয়া হইবে।

Intermediate College-এর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া Dey Commission বলিয়াছেন যে, Degree Course তিন বৎসরের হওয়া উচিত। পশ্চিমবঙ্গে যে ছত্রিশটি Intermediate College আছে সেগুলিতে High School-এর দুইটি Class যোগ করিয়া High Secondary School-এ পরিণত করিতে হইবে। Intermediate College সম্বন্ধে Mudaliar Commission ও Dey Commission-এর মতামতে বিশেষ পার্থক্য নাই।

Degree College :

আজকাল দেখা যায়, প্রবেশিকা বা স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা পাস করিয়া ছেলেমেয়েরা দলে দলে কলেজে ভর্তি হয়। কিন্তু সকল ছেলেমেয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের উপযুক্ত নহে। তাহা ছাড়া, তাহারা স্কুলে যে শিক্ষা লাভ করে, তাহা দ্বারা কলেজে প্রবেশ করিবার জন্য তাহাদের মানসিক প্রস্তুতি হয় কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। এখন দেখা যাউক, বিভিন্ন কমিশন এ বিষয়ে কি সুপারিশ করিয়াছেন।

Sadlar Commission :

যে সমস্ত ছেলেমেয়ে কলেজে পড়িতে আসে, তাহাদের বেশীর ভাগই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-পদ্ধতি ও পাঠের যোগ্যতা অর্জন করিতে পারে নাই। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করিলেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠের যোগ্যতা লাভ করা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠের উপকারিতা লাভ করিতে হইলে, ছাত্রদের ইংরাজী ভাষায় বেশ দখল থাকা এবং চরিত্র

ও মনের আরও প্রসার লাভ করা দরকার। Intermediate Class-গুলিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশ ধরা উচিত নহে ; তবে এখানে ছাত্র ও ছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তুত করা হয়। মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার হইলে Intermediate College উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা-নিকেতন বলিয়া গণ্য হইবে। মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নত হইলে তবেই শিল্প ও কল-কারখানাগুলিতে যোগ্য নেতার অভাব হইবে না। যদি Intermediate Class-গুলিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের প্রস্তুতি বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে ছাত্রদের তিন বৎসর কলেজে পড়িয়া ডিগ্রী লাভ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

Mudaliar Commission :

বর্তমানে Intermediate এবং B.A. College-এর প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে (1st Year Class) ছাত্র-ছাত্রীদের নূতন শিক্ষা-নিকেতন এবং নূতন শিক্ষা-পদ্ধতির সহিত মানাইয়া লইতে অনেক সময় বৃথা নষ্ট হয়। Intermediate Class উঠাইয়া দিয়া তিন বৎসরের Degree Course প্রবর্তন করিলে একদিকে যেমন অনেক সময় বাঁচিবে, আবার অন্যদিকে শিক্ষা-সম্পর্কীয় পরিকল্পনা ও কার্যাবলীরও সুবিধা হইবে। Intermediate পরীক্ষার জন্য কলেজের একটানা পড়ায় বাধা পড়ে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, মাধ্যমিক স্তরে একটি শ্রেণী বাড়াইয়া দিলে শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাইবে এবং একাদিক্রমে তিন বৎসর ডিগ্রী কলেজে পড়িবার সুযোগও পাওয়া যাইবে।

এদেশে দুই প্রকারের কলেজ আছে। কোন কোন রাজ্যে এই কলেজগুলিতে দুই বৎসরের Degree Course আছে এবং অন্যান্য রাজ্যে চারি বৎসর কলেজীয় পাঠের মধ্যে দুই বৎসর Intermediate Course এবং দুই বৎসর Degree Course পড়াইবার ব্যবস্থা আছে। যে সকল রাজ্যে দুই বৎসরের Degree Course আছে, তাহাদের

পাঠ্যকাল এক বৎসর বাড়াইয়া দেওয়া উচিত এবং যে সকল Degree College-এ চারি বৎসর পড়াইবার ব্যবস্থা আছে, তাহাদের প্রথম বৎসরকে কলেজীয় শিক্ষার প্রস্তুতি হিসাবে রাখিয়া বাকী তিন বৎসরে Degree Course শেষ করিতে হইবে। যাহারা দশম শ্রেণীযুক্ত উচ্চ বিদ্যালয় হইতে পাস করিয়াছে, প্রস্তুতি (Preparatory) শ্রেণীতে তাহারা ভর্তি হইবে। তাহা হইলে চারি শ্রেণীযুক্ত যে সকল Degree College আছে, সেখানে উচ্চ এবং উচ্চতর উভয় প্রকার মাধ্যমিক বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা পড়ার সুযোগ পাইবে।

International Team :

Mudaliar Commission-এর সুপারিশ সম্বন্ধে অনেকের মত-ভেদ আছে।

(১) পাঁচ বৎসরের উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু যাহারাই মাধ্যমিক শিক্ষা চায় তাহাদেরই চারি বৎসর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়িতেই হইবে, ইহার কোন সার্থকতা নাই। যাহাদের তিন বৎসরের মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করিতে হয়, তাহাদের কোন অসুবিধা যাহাতে না হয় তাহা দেখিতে হইবে।

(২) এক ধাঁচের শিক্ষা-ব্যবস্থা সুবিধাজনক হইতে পারে কিন্তু ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। শিক্ষার কাঠামো নমনীয় হইলে, ছাত্র-ছাত্রীদের বুদ্ধি, যোগ্যতা ও বিভিন্ন পরিবেশে নিজেদের মানাইয়া লওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

(৩) ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বৎসরের ডিগ্রী ব্যবস্থা থাকিলেও প্রথম বৎসর বয়সের পূর্বে কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে না।

(৪) ভারতবর্ষে Intermediate Course বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশ হইলেও অনেক ছাত্র-ছাত্রী মাধ্যমিক স্তরের পর নানা কারণে পড়াশুনা শেষ করিয়া থাকে। বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরের পর নানারকম

বৃত্তিমূলক শিক্ষণ-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার সুযোগ পাওয়া যায়। সেইজন্য বিভিন্ন শিক্ষাধারার সঙ্গমস্থল মাধ্যমিক স্তরটি উঠাইয়া দেওয়া যুক্তিযুক্ত হইবে না।

(৫) বিদ্যালয় ও কলেজীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে ভিন্ন স্তর থাকা দরকার। সেখান হইতে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা ছাড়াও বিভিন্ন প্রকার শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ পায়।

(৬) Mudaliar Commission স্বীকার করিয়াছেন যে, বর্তমান উচ্চ বিদ্যালয়গুলির বেশীর ভাগ উপস্থিত কয়েক বৎসরের মধ্যে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে (Higher Secondary School) পরিবর্তিত হইতে পারিবে না। এই রকম অবস্থায় যদি বিভিন্ন রাজ্য High School, Higher Secondary School, Intermediate College এবং Degree College সম্পর্কীয় সমস্যা সমাধান করিতে যায়, তাহা হইলে বুনিয়াদী শিক্ষা-বিস্তার এবং মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কারের কার্য ব্যাহত হয়।

উল্লিখিত মতভেদের বিষয় চিন্তা করিয়াই International Team সুপারিশ করিয়াছেন যে, মাধ্যমিক শিক্ষা চারি বৎসরব্যাপী Higher Secondary School অথবা তিন বৎসরব্যাপী High School-এ চলিতে পারে। দুই প্রকার বিদ্যালয়েই পাঠ্যক্রম এমন হইবে যাহাতে শিক্ষার্থীরা এখানে পাঠের শেষে কর্মক্ষেত্রে বা প্রয়োজনবোধে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারে।

যতদিন পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক না হয়, ততদিন এমন অনেক ছেলেমেয়েই আর্থিক অস্বচ্ছলতা হেতু High School-এর পড়া শেষ করিয়া, কোন-না-কোন বৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবে। এই প্রকার ছাত্রদের আরও এক বৎসর স্কুলে থাকিয়া Higher Secondary School-এর স্তর শেষ করিতে বাধ্য

করা উচিত হইবে না। বিশেষ করিয়া লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, High School-এর শিক্ষা এমন হওয়া উচিত যাহাতে ছাত্র-ছাত্রীরা তাহাদের জন্মগত শক্তি ও আগ্রহ বিকাশের সুযোগ পায় এবং High School-এ পাঠ শেষ হইলে তাহারা পূর্ণ বা অবসরকালীন বৃত্তিমূলক শিক্ষালাভের সুবিধা পায়।

যদি Higher Secondary School-এর চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষক ও শিক্ষোপকরণ Intermediate College-এর মত না হয়, তাহা হইলে এই সকল Higher Secondary School হইতে যে সকল ছাত্র-ছাত্রী বাহির হইবে তাহারা Intermediate College-এর মান অর্জন করিতে পারিবে না। তাহার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মানই কমিয়া যাইতে পারে। কাজেই High Schoolকে Higher Secondary School-এ পরিবর্তিত করিবার পূর্বে ইহাদের যোগ্যতা এমনই হইবে যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নিম্নতর না হয়।

অপরপক্ষে, চারি শ্রেণীযুক্ত Higher Secondary School-এ অপেক্ষাকৃত পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের প্রস্তুত করা হয়। কাজেই সম্ভব হইলে High Schoolকে Higher Secondary School-এ পরিবর্তন করিবার চেষ্টা করা উচিত।

Dey Commission-এর Repoet-এ কলেজীয় শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই। বর্তমানের Intermediate Collegeগুলির সহিত দুইটি শ্রেণী যোগ করিয়া এগুলিকে Higher Secondary School-এ রূপান্তরিত করিবার সুপারিশ করা হইয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ

১৯০২ সালে যে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন নিযুক্ত হয়, সেই কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাবাধীন হয়। ১৯০৪ সালের ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় Act অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ বিদ্যালয়ের অনুমোদন দান করিবে, এই ঠিক হয়। তাহার পর হইতে মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে দ্বৈত শাসন চলিয়া আসিতেছিল। উচ্চ বিদ্যালয় মঞ্জুরি (recognition) লাভ করিত বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হইতে, কিন্তু সরকারের শিক্ষা-বিভাগ বিদ্যালয় পরিদর্শন করিত এবং সাহায্য দান করিত। মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এই দ্বৈত শাসন শেষ করিবার সুপারিশ বিভিন্ন কমিটি ও কমিশন করিয়াছিলেন। বাংলাদেশে মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ স্থাপন করিবার জন্য Assemblyতে কয়েকবার বিলও আনয়ন করা হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৫০ সালের পূর্বে এই প্রদেশে মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ স্থাপন করা সম্ভব হয় নাই।

এখন বিভিন্ন কমিশন মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ স্থাপন সম্বন্ধে কি সুপারিশ করিয়াছেন, দেখা যাউক।

Sadlar Commission :

এদেশে বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা-বিভাগের মাধ্যমিক শিক্ষা-পরিচালনার দায়িত্ব যুক্তভাবে ভাগাভাগি রহিয়াছে। ইহার পরিবর্তে এমন একটি তত্ত্বাবধায়ক সংস্থা স্থাপন করিতে হইবে যাহা বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা-বিভাগে অভিজ্ঞতার সুযোগ পাইবে এবং যাহার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিবে সেই সকল শিল্প, বাণিজ্য ও বৃত্তির প্রতিভূ যেখানে ছেলে-মেয়েরা স্কুল ও কলেজের পড়া শেষ করিয়া কর্ম-সংস্থানের জন্য যাইবে।

অতএব মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার ও উন্নতির দায়িত্ব Secondary ও Intermediate Board-এর উপর অর্পণ করিতে হইবে। এই Board পরামর্শদায়ক সংস্থা হইলে চলিবে না, Secondary ও Intermediate শিক্ষার সমস্ত দায়িত্ব ও ক্ষমতা ইহার থাকিবে।

Board গঠন :

Board of Secondary and Intermediate Education গঠন করিবার পূর্বে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে:—

প্রথমতঃ, কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি বোর্ডে থাকিবেন যাহাতে এই বোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ পায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন সম্বন্ধে সজাগ থাকিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতিনিধিও বোর্ডে থাকিবেন যাহাতে ছাত্রেরা বাস্তব জীবনে যে-সব বৃত্তি অবলম্বন করিবে তাহার চাহিদা সম্বন্ধে বোর্ড অবহিত হইতে পারে। তৃতীয়তঃ, ছাত্রদের শারীরিক উন্নতি হইতে পারে এবং বিদ্যালয়ের পরিবেশ স্বাস্থ্যকর হয়, তাহা দেখা বোর্ডের কর্তব্য; সেইজন্য বোর্ডের সভ্য হিসাবে একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার থাকা উচিত। চতুর্থতঃ, শিক্ষা-বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাধ্যমিক কলেজের কাজের সঙ্গে পরিচিত দুই-একজন সভ্য বোর্ডে থাকা উচিত যাহাতে নূতন পাঠ্যক্রম বা পরীক্ষা-ব্যবস্থা ছাত্র-ছাত্রীদের উপযুক্ত কি না বিচার করিতে পারেন।

ইহা ছাড়া, বোর্ড গঠন করিবার পূর্বে আরও কয়েকটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বোর্ডের সহিত Legislative Council-এর বে-সরকারী সদস্যদের যোগ থাকা দরকার। বোর্ড ও শিক্ষা-বিভাগের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিবার জন্য Director of Public Instruction পদাধিকারবলে বোর্ডের সভ্য হইবেন। বোর্ডে হিন্দু ও মুসলমান সমাজের যথেষ্ট প্রতিনিধি থাকা উচিত।

উপরোক্ত শর্তাধীনে নিম্নলিখিত সভ্য লইয়া বোর্ড গঠিত হইবে :—

১। সভাপতি—বেতনভোগী পুরাপুরি কর্মচারী; তিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

২। শিক্ষা-অধিকর্তা (Director of Public Instruction) —পদাধিকারবলে।

৩। Legislative Council-এর বে-সরকারী সদস্য দ্বারা নির্বাচিত একজন সভ্য।

৪—১০। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭ জন প্রতিনিধি থাকিবেন। তাহার মধ্যে ৫ জন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ও ২ জন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

১১—১৫ (১৮)। বাংলা সরকার নিম্নলিখিত বিষয়ে অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন ৫ হইতে ৮ জন সভ্য নিযুক্ত করিবেন :—

(ক) কৃষি;

(খ) শিল্প ও বাণিজ্য;

(গ) চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য;

(ঘ) মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও Intermediate College-এর শিক্ষা;

(ঙ) মেয়েদের শিক্ষা;

(চ) অন্য স্থান হইতে আসিয়া স্থায়িভাবে বাস করিতেছে যে-সব সম্প্রদায় তাহাদের শিক্ষা।

বোর্ডের সভ্যেরা সাধারণতঃ তিন বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবেন এবং ইচ্ছা করিলে পুনরায় নির্বাচনপ্রার্থী হইতে পারেন।

বোর্ড গঠন করা হইলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকা ও Intermediate পরীক্ষার ফি বাবদ যে টাকা আদায় করিত, তাহা হইতে বঞ্চিত হইবে। অতএব বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য সরকারকে অর্থসাহায্য করিতে হইবে।

Board-এর কাজ :

Board-এর কাজ হইবে Intermediate College-এর পাঠ্য-সূচী নির্ধারণ করা এবং Intermediate পরীক্ষা পরিচালনা করা। High School-এর শেষে যে পরীক্ষা হইবে এবং যে পরীক্ষায় কৃতকার্য হইলে ছাত্র-ছাত্রীরা Intermediate College-এ ভর্তি হইবে, সে পরীক্ষাও Board পরিচালনা করিবে। Board-এর আর একটি কাজ হইবে কোন্ কোন্ High School প্রবেশিকা পরীক্ষায় ছাত্র পাঠাইতে পারিবে তাহা স্থির করা।

Intermediate College অনুমোদন করা, পাঠ্য-সূচী নির্ধারণ করা, পরীক্ষা পরিচালনা করা, পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা এবং কলেজ চালাইবার জন্য সাহায্য দান করা—এই সব কাজগুলিই একই হাতে থাকা উচিত। দুই সংস্থার মধ্যে এই কাজগুলি ভাগ করিয়া দিলে তাহাতে নানা রকম অসুবিধার সৃষ্টি হইতে পারে। সরকারী মাধ্যমিক কলেজগুলি পরিচালনা করিবার ভারও Board-এর উপর দিতে হইবে। Sadlar Commisson-এর মতে মাধ্যমিক স্তরের সমস্ত শিক্ষা-নিকেতনের উপর Board-এর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকা উচিত। সমস্ত সরকারী High School-এর পরিচালনার ভার এবং বে-সরকারী High Schoolগুলিকে কি শর্তে ও কত টাকা সাহায্য দেওয়া হইবে, তাহা নির্ধারণ করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব Board-এর উপর দেওয়া উচিত। অতএব প্রতি বৎসর Boardকে সরকারের নিকট বার্ষিক খরচের একটা আনুমানিক হিসাব দাখিল করিতে হইবে। সরকার তারপর বিচার করিবেন, মাধ্যমিক ও Intermediate শিক্ষার জন্য কত টাকা ব্যয় করা যাইবে। কিন্তু High School, Intermediate College এবং অন্যান্য বিষয়ে কত টাকা খরচ হইবে, তাহাও Board বিচার করিবে।

এখন কথা হইতেছে, Board ও Government-এর মধ্যে শাসন-

তান্ত্রিক সম্বন্ধ কি প্রকার হইবে? Board হইবে একটি মিশ্র প্রতিনিধি-সংস্থা (Composite Representative Body)। ইহার বেশীর ভাগ সভ্য হইবে বে-সরকারী; অতএব ইহা সব সময় সরকারের তাঁবে থাকিবে না। অবশ্য ইহা বাঞ্ছনীয় যে, মাধ্যমিক ও Intermediate শিক্ষার মঙ্গলের জন্য আইন প্রণয়ন করিবার পূর্ণ ক্ষমতা বোর্ডের থাকিবে, তথাপি বোর্ডকে সরকারের নিকট দায়ী থাকিতে হইবে। যদি কোন ক্ষেত্রে বোর্ড ও সরকারের মধ্যে মতভেদ হয়, তাহা হইলে সরকারের মতই বলবৎ হইবে। বোর্ড প্রতি বৎসর সরকারের আগামী বৎসরের খরচের একটা আনুমানিক হিসাব দিবে; বোর্ডের কোন প্রস্তাবে সরকারের আপত্তি থাকিলে সরকার টাকা কমাইয়া দিতে পারেন। বোর্ডের আইন-কানুনগুলি ছাপা হইয়া সরকার ও আইনসভার গোচরীভূত করা হইবে এবং ইহার দোষগুণের সমালোচনা করা যাইবে। বোর্ডের উপর এই সমালোচনার প্রভাব যথেষ্ট থাকিবে। সরকার ও বোর্ডের মধ্যে মতভেদ হইবার সম্ভাবনা খুব বেশী আছে বলিয়া মনে হয় না। যদি কখন সরকার ও বোর্ডের মধ্যে গভীর মতভেদ হয়, তাহা হইলে সরকার বোর্ডকে বাতিল করিয়া দিতে পারিবেন। কিন্তু যদি কখন এইরূপ অবস্থা দাঁড়ায়, তাহা হইলে সরকার বিষয়টি Legislative Council-এ উত্থাপন করিবেন এবং সমস্ত বিবরণ দিয়া দেখাইবেন, কি কারণে সরকারকে এই চরম পন্থা গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

Mudaliar Commission :

Mudaliar Commission-এর মতে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা পরিচালনা করিবার জন্য একটি Board of Secondary Education (মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষৎ) গঠিত হওয়া উচিত। শিক্ষা-অধিকর্তা (Director of Education) ইহার সভাপতি হইবেন। এই বোর্ড সেই

সকল ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত হইবে যাহাদের মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আছে। এই বোর্ডে ২৫ জনের বেশী সভ্য থাকিবেন না। ইহার মধ্যে অন্ততঃ ১০ জন হইবেন কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় পারদর্শী।

Mudaliar Commission-এর মতে Board of Secondary Education নিম্নলিখিত সভ্য লইয়া গঠিত হইবে :—

১। বৃত্তিমূলক শিক্ষার সহ-অধিকর্তা (Joint Director of Vocational Education)।

২। কৃষি-অধিকর্তা (Director of Agriculture)।

৩। শিল্পাধিকর্তা (Director of Industries)।

৪। Polytechnic-এর একজন প্রধান কর্মকর্তা।

৫—৬। বৃত্তিমূলক বিদ্যালয়গুলির দুইজন প্রতিনিধি (সরকার কর্তৃক মনোনীত)।

৭। স্ত্রী-শিক্ষার সহ-অধিকর্ত্রী (Deputy Directress of Women's Education)।

৮—১১। উচ্চ বিদ্যালয়ের ৪ জন প্রধান শিক্ষক, ইহার মধ্যে সর্বার্থ-সাধক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকও (সরকার কর্তৃক মনোনীত) থাকিবেন।

১২—১৩। প্রদেশের মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি কর্তৃক নির্বাচিত দুইজন প্রতিনিধি।

১৪—১৭। প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে চারিজন মনোনীত প্রতিনিধি, ইহাদের মধ্যে অন্ততঃ দুইজন কারিগরী শিক্ষক-অধ্যাপক হইবেন।

১৮—১৯। বোর্ডের সভ্যদের কর্তৃক গৃহীত (co-opted) দুইজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্।

২০—২২। শিক্ষা-বিভাগ কর্তৃক মনোনীত দুইজন ব্যক্তি এবং সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন শিক্ষক—মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ (Principal of a Training College)।

২৩। একজন সহ-অধিকর্তা সচিব-সভ্য (Secondary-member)।

Board-এর কাজ ঃ

নিম্নলিখিত বিষয়গুলির জন্যই Board দায়ী থাকিবে ঃ—

১। High School এবং Higher Secondary School-এর মঞ্জুরির (recognition) শর্তাবলী নির্ধারণ করা এবং শিক্ষকদের যোগ্যতা নির্ধারণ করা।

২। বিভিন্ন শিক্ষাপত্রের (Courses of Study) পাঠ্য-সূচী নির্ধারণ করিবার জন্য বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের লইয়া কমিটি গঠন করা।

৩। বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী পাঠ্যক্রম প্রস্তুত করা।

৪। প্রশ্নপত্র-কারক (Paper setters), প্রধান পরীক্ষক এবং সহকারী পরীক্ষকদের অনুমোদিত তালিকা (panels) তৈয়ারি করা।

৫। পরীক্ষক এবং সহকারী পরীক্ষক নিয়োগ করিবার নিয়মাবলী ও শর্তাবলী নির্ধারণ করা এবং এই ব্যবস্থা ভালভাবে চালু করিতে হইলে যে সকল নিয়ম-কানুন দরকার হইবে তাহা প্রস্তুত করা।

৬। মাধ্যমিক শিক্ষা-সংক্রান্ত সকল বিষয়ে প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষাকর্তাকে উপদেশ দেওয়া।

Mudaliar Commission অন্যান্য কয়েকটি প্রদেশের মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষৎ সম্বন্ধে বলেন, ইহাদের সভ্যসংখ্যা খুব বেশী এবং এই বোর্ডে যে সকল বিভিন্ন বিভাগীয় ব্যক্তিকে সভ্য করা হইয়াছে, তাঁহাদের দ্বারা বোর্ডের কর্মকুশলতাও বাড়িবে না এবং সভ্যদের মধ্যে একসঙ্গে কাজ

করিবার মনোভাবও থাকিবার সম্ভাবনা কম। যদি বোর্ডকে সত্যই কার্যকারী করিতে হয়, তাহা হইলে বিশেষজ্ঞদের লইয়াই বোর্ড গঠন করিতে হইবে এবং শিক্ষার নীতি ঠিক করাই ইহার প্রধান কার্য হইবে। প্রধান কর্মকর্তা (Executive Head) হইবেন শিক্ষা-অধিকর্তা।

পরীক্ষা পরিচালনা করিবার জন্য পাঁচজন সভ্য লইয়া একটি ছোট কমিটি গঠন করা হইবে; শিক্ষা-অধিকর্তা বা শিক্ষাধিকারের কোন একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী হইবেন ইহার আহ্বায়ক। এই কমিটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবেন, পরীক্ষা পরিচালনা করিবেন এবং পরীক্ষার ফল বাহির করিবেন। এই কার্যে শিক্ষাধিকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী কয়েকজন সহকারীসহ শিক্ষা-অধিকর্তাকে সাহায্য করিবেন এবং পরীক্ষা সম্বন্ধীয় খুঁটিনাটি কার্য দেখিবেন।

মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষতের সুপারিশগুলি কার্যকরী করিবার পূর্ণক্ষমতা থাকিবে শিক্ষা-অধিকর্তার উপর। সাধারণতঃ বৎসরে দুইবার বোর্ডের সভা হইবে, কিন্তু ইহা ছাড়াও অন্য সময় বোর্ডের সভা হইতে পারে যদি সভাপতি সভা আহ্বান করেন অথবা বোর্ডের ⅓ ভাগ সদস্য সভা আহ্বানের দাবী করেন।

Dey Commission :

Sadlar Commission ও Mudaliar Commission-এর ন্যায় Dey Commission-ও মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষৎ সম্বন্ধে তাঁহাদের Report-এ আলোচনা করিয়াছেন।

স্বাধীন ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষা-পরিকল্পনার ভার সম্পূর্ণরূপে সরকারের উপর থাকা উচিত। পূর্বের মতো জনসাধারণের হাতে শিক্ষার ভার ছাড়িয়া দেওয়া যায় না; কারণ তাহাতে শিক্ষার উন্নতি ব্যাহত হইবে এবং শিক্ষা-ব্যবস্থা হইবে এলোমেলো ও অনুন্নত। আর যদি অন্য কোন সংস্থার হাতে শিক্ষা-পরিচালনার ভার দেওয়া হয়,

তাহা হইলে সরকারের কর্তৃত্ব পরোক্ষভাবে থাকায় শিক্ষার প্রসার ও উন্নতি কোনটাই হইবে না। কতকগুলি জিনিস আছে (শিক্ষাও তাহার মধ্যে একটি) যাহা সমষ্টির বিচারের উপর ছাড়িয়া দেওয়া চলে না; কারণ এখানে উৎকর্ষতাই বাঞ্ছনীয়। সরকার টাকা দিবে; অতএব শিক্ষা-পরিকল্পনা ও তাহার রূপায়ণ সরকারেরই হাতে থাকা উচিত।

অনেকে স্বাধীন বোর্ড (autonomous) স্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বিদেশী শাসন শেষ ও সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট সরকারের অবসান হওয়ার পর এখন আর সরকারের প্রতি অনাস্থার কোন কারণ থাকিতে পারে না। বর্তমান পরিবর্তিত অবস্থায় মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষৎ হইবে পরামর্শদাতা সংস্থা (অবশ্য পর্ষতের পরামর্শ সরকার মানিয়াই চলিবেন আশা করিবেন)। এইরূপ পরামর্শদাতা বোর্ড সরকারী কর্মচারীদের কাজের ত্রুটি দেখাইয়া দিয়া বাধা দিতে পারিবে এবং শিক্ষকদের উপর অন্যায় জুলুম যাহাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে পারিবে। মাধ্যমিক শিক্ষা-পরিচালনার জন্য সরকার আইনসভার নিকট দায়ী হইবেন।

Dey Commission বোর্ড স্থাপন সম্বন্ধে Mudaliar Commission-এর সহিত একমত। বোর্ডের কোন কার্যকরী ক্ষমতা থাকিবে না কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কীয় সকল বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দিবে।

Mudaliar Commission সুপারিশ করিয়াছিলেন যে, শিক্ষা-অধিকর্তা পদাধিকারবলে মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষতের সভাপতি হইবেন। কিন্তু Dey Commission সুপারিশ করিয়াছেন যে, পর্ষতের সভাপতি হইবেন একজন বে-সরকারী সদস্য; শিক্ষা-অধিকর্তা হইবেন একজন বোর্ডের সদস্য। সভাপতির পদমর্যাদা যথেষ্ট উচ্চ হওয়া উচিত, যাহাতে যে পর্ষতের সদস্য শিক্ষা-অধিকর্তা এবং অন্যান্য বিভাগের অধিকর্তা সেখানে তিনি সম্মানের সহিত সভাপতিত্ব করিতে পারেন।

বোর্ডের কাজ ঃ

মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষতের উপর নিম্নলিখিত কাজের ভার থাকিবে ঃ—

১। মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতি এবং মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ রাজ্যের সর্বত্র সমানভাবে বিস্তার করিবার জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করা।

২। বিভিন্ন প্রকার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদিগের যোগ্যতা এবং বিদ্যালয়ে অর্থসাহায্য দিবার শর্তগুলি নির্ধারণ করা।

৩। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মঞ্জুরি ও সাহায্যদানের সুপারিশ করা।

৪। বিভিন্ন শিক্ষাপত্রের (Courses of Study) জন্য পাঠ্য-পুস্তক অনুমোদন করা।

৫। পরীক্ষার জন্য পরীক্ষক, প্রশ্নপত্র-কারক নিয়োগ করা।

৬। বিভিন্ন শিক্ষাপত্রের পাঠ্যক্রম নির্ধারণ ও অন্যান্য নানা বিষয়ে পর্ষৎকে উপদেশ দিবার জন্য উপদেষ্টা সমিতি নিয়োগ করা।

৭। উপদেষ্টা সমিতির সুপারিশ অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণী ও বিভিন্ন পত্রের জন্য পাঠ্যক্রম প্রস্তুত করা।

৮। শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতির (Managing Committee) মধ্যে বিরোধ মিটানো।

৯। মাধ্যমিক শিক্ষা-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দান করা।

উপরে বোর্ডের কাজের যে তালিকা দেওয়া হইল, তাহার মধ্যে ১—৫ সংখ্যায় বর্ণিত বিষয়ে সরকার কোন সিদ্ধান্তে আসিবার পূর্বে পর্ষতের মতামত গ্রহণ করিবেন ; বাকী চারিটি সংখ্যায় (৬—৯) যে কাজের কথা বলা হইয়াছে, সে বিষয়ে সরকার বোর্ডের পরামর্শ অনুসারে কাজ করিবেন।

সরকার বা বোর্ডের সুপারিশ অনুসারে কাজ করিবার দায়িত্ব থাকিবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর।

Dey Commission-এর মতে Board নিম্নলিখিত সদস্যদের লইয়া গঠিত হইবে :—

১। সভাপতি—সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন বে-সরকারী ব্যক্তি।

২। শিক্ষা-অধিকর্তা (পদাধিকারবলে)।

৩। কৃষি-অধিকর্তা বা তাঁহার প্রতিনিধি—পদমর্যাদায় তিনি সহ-অধিকর্তার নিম্নস্তরের হইবেন না—(পদাধিকারবলে)।

৪। শিল্পাধিকর্তা বা তাঁহার প্রতিনিধি—পদমর্যাদায় ইনি সহ-অধিকর্তার নীচে হইবেন না—(পদাধিকারবলে)।

৫। জনস্বাস্থ্য-অধিকর্তা বা তাঁহার প্রতিনিধি—পদমর্যাদায় ইনি সহ-অধিকর্তার নীচে হইবেন না—(পদাধিকারবলে)।

৬। Chief Engineer বা তাঁহার প্রতিনিধি—ইনি পদমর্যাদায় Superintending Engineer-এর নীচে নহেন—(পদাধিকারবলে)।

৭—৮। বাণিজ্য ও শিল্পের প্রতিনিধি সরকার কর্তৃক মনোনীত হইবেন।

৯। কোন Polytechnic-এর Principal, সরকার মনোনীত বে-সরকারী ব্যক্তি হইলেই ভাল হয়।

১০। শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ (Principal of a Training College) বে-সরকারী ব্যক্তি মনোনীত হইলেই ভাল হয়।

১১। বহুমুখী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ (Principal of a Multipurpose Higher Secondary School)।

১২। একজন মনোনীত Intermediate College-এর অধ্যক্ষ বে-সরকারী মনোনীত ব্যক্তি।

১৩—১৫। তিনজন প্রধান শিক্ষক (ইহাদের মধ্যে একজন হইবেন প্রধানা শিক্ষয়িত্রী)। ইহারা বে-সরকারী স্কুলের শিক্ষক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ইহারা সকলেই নির্বাচিত হইবেন।

১৬—১৭। High School বা Higher Secondary School-এর দুইজন শিক্ষক। ইঁহাদের মধ্যে একজন হইবেন শিক্ষিকা।

১৮—১৯। আইনসভার দুইজন সদস্য—একজন Assembly ও একজন Council হইতে আইনসভার সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন।

২০—২২। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন।

২৩—২৫। বোর্ডের সভাপতি দ্বারা তিনজন মনোনীত হইবেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন হইবেন মহিলা।

Deputy Director-এর পদমর্যাদাসম্পন্ন কোন শিক্ষা-বিভাগীয় কর্মচারী হইবেন পর্ষতের সচিব; আর একজন Deputy Director পরীক্ষা পরিচালনার ভার গ্রহণ করিবেন। এই দুইজন Deputy Director মর্যাদায় সমকক্ষ হইবেন। পরীক্ষা চালাইবার জন্য যে Deputy Director নিযুক্ত হইবেন, তিনি পরীক্ষা পরিচালনা সমিতির সচিব হইবেন।

পর্ষতের নিম্নলিখিত স্থায়ী সমিতি থাকিবে :—

১। পরিকল্পনা ও পরিবর্ধন সমিতি (Planning & Development Committee)।

২। মঞ্জুরি ও সাহায্যদান সমিতি (Recognition & Grants Committee)।

৩। নিয়ম-নির্ধারক সমিতি (Regulation Committee)।

এই কমিটি প্রত্যেক বিষয়ে শিক্ষাপত্র (Courses of Study) স্থির করিবার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ সমিতি নিয়োগ করিবেন। এই কমিটিতে একজন প্রধান শিক্ষক ও বিশেষ বিষয়ের জন্য এক-একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক থাকিবেন।

৪। পরীক্ষা সমিতি (Examination Committee)।

৫। আপীল সমিতি (Appeal Committee)।

মেয়েদের শিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সহযোগ রক্ষা করিবার জন্য একটি করিয়া কমিটি থাকিবে। এই কমিটিগুলি যতদূর সম্ভব সভ্যদের সদস্য লইয়া গঠিত হইবে।

মঞ্জুরি ও সাহায্য কমিটি বিদ্যালয়ের দরখাস্তগুলি সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া সরকারের কাছে সুপারিশ করিবেন।

Regulation Committee পরীক্ষা পরিচালনা সম্বন্ধে ও অন্যান্য বিষয়ে নিয়ম প্রস্তুত করিবেন এবং পাঠ্য-সূচী নির্ধারণের জন্য কমিটি নিয়োগ করিবেন। Regulation Committee স্ত্রী-শিক্ষা কমিটির সহিত পরামর্শ করিয়া স্ত্রী-শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন এবং বিভিন্ন শিক্ষার জন্য কি কি প্রয়োজন, তাহা বিচার করিয়া দেখিবেন।

অনুমোদিত তালিকা হইতে পরীক্ষা কমিটি Examiner, Paper-setter, Moderator, Tabulator ও Scrutiniser নিযুক্ত করিবেন। পরীক্ষা কমিটির সভ্য হইবেন পর্ষতের সভাপতি, শিক্ষাধিকর্তা এবং অপর তিনজন সদস্য। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন এমন কোন ব্যক্তি এই কমিটির সভ্য হইতে পারিবেন না। কিন্তু পরীক্ষা পরিচালনা করিবেন পরীক্ষা কমিটির সচিব।

শিক্ষক ও বিদ্যালয় পরিচালনা সমিতির মধ্যে বিবাদ হইলে Appeal Committee তাহার বিচার করিবেন।

Dey Commission সুপারিশ করিয়াছেন যে, মাধ্যমিক শিক্ষা-পর্ষতের সঙ্গে সঙ্গেই পর্ষৎকে পরামর্শ দিবার জন্য আঞ্চলিক কমিটি গঠন করা হইবে। অঞ্চলের সীমানা নির্ভর করিবে স্কুলের সংখ্যার উপর, তবে একটি মহকুমাকে একক ধরিয়া অঞ্চল ভাগ করাই উচিত।

আঞ্চলিক মাধ্যমিক শিক্ষা-পরামর্শদাতা সমিতি নিম্নলিখিত ৯ জন সদস্য লইয়া গঠিত হইবে :—

১। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জিলা-পরিদর্শক (পদাধিকারবলে)।

২। মহকুমা সমাহর্তা (Sub-Divisional Officer)—(পদাধিকারবলে)।

৩—৪। স্কুল পরিচালনা সমিতির (Managing Committee) দুইজন প্রতিনিধি।

৫—৬। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দুইজন প্রধান শিক্ষক।

৭। নির্দিষ্ট অঞ্চলে কোন কলেজ থাকিলে তাহার অধ্যক্ষ।

৮—৯। শিক্ষা-বিষয়ে উৎসাহী দুইজন স্থানীয় ব্যক্তি।

প্রথমে মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষতের সভাপতি এই আঞ্চলিক পরামর্শ সমিতি মনোনয়ন করিবেন। তিনিই আঞ্চলিক সমিতির সভাপতি নির্বাচন করিবেন। জিলা-স্কুল পরিদর্শক হইবেন এই সমিতির আহ্বায়ক (Convener)। এই কমিটির সদস্যেরা দুই বৎসরের জন্য মনোনীত হইবেন। স্কুল পরিচালনা সমিতির সভাপতি ও প্রধান শিক্ষকেরা বিভিন্ন স্কুল হইতে ধারাবাহিকভাবে (by rotation) নির্বাচিত হইবেন। দুইজন শিক্ষাবিদ্‌ও পুনরায় মনোনীত হইতে পারেন। নির্বাচন না থাকাই ভাল।

আঞ্চলিক পরামর্শদাতা সমিতি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা, নূতন বিদ্যালয় স্থাপন, শিক্ষক বাছিয়া লওয়া এবং অন্যান্য যে সকল বিষয় বোর্ড কর্তৃক নির্দেশ দেওয়া হইবে, সেই সব বিষয়ে বোর্ডকে পরামর্শ দিবেন। কেন্দ্রের সমিতি এই রকমভাবে আঞ্চলিক বিশেষজ্ঞদের উপদেশ অনুসারে সুষ্ঠুভাবে কাজ করিতে পারিবেন।

১৯৫০ সালে পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষা-আইন পাস হয় এবং পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষৎ স্থাপিত হয়। এখন ১৯৫০ সালের আইনে মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষৎ গঠন-প্রণালী ও ইহার কার্য সম্বন্ধে কি বলা হইয়াছে, তাহা দেখা যাউক।

এই আইন অনুসারে স্থির হইয়াছিল যে, নিম্নলিখিত সভ্যদের লইয়া পর্ষৎ গঠিত হইবে ঃ—

১। সভাপতি (পদাধিকারবলে)।

২। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ (Vice-Chancellor of the Calcutta University)—পদাধিকারবলে।

৩। শিক্ষা-অধিকর্তা (Director of Public Instruction)—পদাধিকারবলে।

৪। শিল্পাধিকর্তা (Director of Industries)—পদাধিকারবলে।

৫। কৃষি-অধিকর্তা (Director of Agriculture)—পদাধিকারবলে।

৬। স্বাস্থ্য-বিভাগের অধিকর্তা (Director of Health Services)—পদাধিকারবলে।

৭। যুবকল্যাণ অধিকর্তা (Youth Welfare Officer)—পদাধিকারবলে।

৮। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ (পদাধিকারবলে)।

৯। যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেক্‌নিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ—(পদাধিকারবলে)।

১০—১২। সরকার কর্তৃক নিযুক্ত শিক্ষা-বিভাগের তিনজন কর্মচারী।

১৩—২০। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্বাচিত এই আটজনের মধ্যে অন্ততঃপক্ষে পাঁচজন বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকাধীন কলেজের অধ্যক্ষ বা অধ্যাপক অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হইবেন।

২১—২৩। অনুমোদিত উচ্চ বিদ্যালয়ের তিনজন প্রধান শিক্ষক (প্রধান শিক্ষকদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন)।

২৪। অনুমোদিত উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের একজন প্রধানা শিক্ষয়িত্রী (প্রধানা শিক্ষয়িত্রীদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন)।

২৫—২৬। অনুমোদিত উচ্চ বিদ্যালয়ের সরকারী শিক্ষকদের দুই-জন প্রতিনিধি (ইহারা সহকারী শিক্ষকদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন)।

২৭। অনুমোদিত উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের একজন সহকারী শিক্ষিকা (উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকাদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন)।

২৮—৩০। অনুমোদিত উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালনা সমিতিগুলির তিনজন প্রতিনিধি (পরিচালনা সমিতির সভ্যদের দ্বারা নির্বাচিত)।

৩১—৩২। District School Board-এর সভ্যদের দ্বারা নির্বাচিত দুইজন সভ্য।

৩৩—৩৫। Legislative Assembly-র সভ্যদের দ্বারা নির্বাচিত একজন প্রতিনিধি।

৩৬। পশ্চিম বাংলার Board of Anglo-Indian Education-এর সভ্যদের দ্বারা নির্বাচিত একজন প্রতিনিধি।

৩৭। কারিগরী শিক্ষাপর্ষৎ (Board of Technical Education) দ্বারা নির্বাচিত একজন সদস্য।

৩৮—৪১। কৃষি, শিল্প বা বাণিজ্য বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন চারিজন ব্যক্তি পর্ষতের সভ্যদের দ্বারা মনোনীত।

৪২। বিশ্ব-ভারতীয় সংসদের সভ্যদের দ্বারা নির্বাচিত একজন সদস্য।

৪৩—৪৪। স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন দুইজন মহিলা সদস্য পর্ষতের সভ্যদের দ্বারা মনোনীত।

পর্ষৎ স্থাপনের পর প্রথম পাঁচ বৎসর রাজ্য সরকার যাঁহাকে উপযুক্ত মনে করিবেন, তাঁহাকে পর্ষতের সভাপতি নিযুক্ত করিতে পারেন। তাহার পর পর্ষতের সভ্যদের দ্বারা অনুমোদিত চারিজন তালিকাভুক্ত

ব্যক্তিদের মধ্যে যে-কোন একজনকে রাজ্য সরকার সভাপতি নিযুক্ত করিতে পারেন। প্রথম সভাপতি পাঁচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইবেন এবং তাহার পর সভাপতিদের কার্যকাল চারি বৎসর স্থায়ী হইবে।

পর্ষৎ গঠন হইবার পর প্রতি বৎসর সভ্যেরা একজন করিয়া উপ-সভাপতি নির্বাচন করিবেন।

Board-এর কাজ ঃ

সারা রাজ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা-বিস্তারের জন্য যাহা করা কর্তব্য তাহা মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষৎকেই করিতে হইবে।

বোর্ডকে High School-এর সংখ্যা, অবস্থা এবং শিক্ষোপকরণ কিরূপ আছে তাহা দেখিতে হইবে এবং এই সকল স্কুলে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা ছাত্রদের প্রয়োজন, যোগ্যতা ও ক্ষমতা অনুযায়ী হইতেছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।

বোর্ড স্থাপিত হইবার দুই বৎসরের মধ্যে বোর্ডকে এই রাজ্যের শিক্ষা-ব্যবস্থা পর্যালোচনা করিয়া যে সকল স্থানে মাধ্যমিক শিক্ষা-লাভের সুষ্ঠু সুযোগ নাই সেখানে শিক্ষা-বিস্তারের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া সরকারের নিকট পেশ করিতে হইবে। শিক্ষা-বিস্তারের পরি-কল্পনা সরকারের নিকট পেশ করার দুই মাসের মধ্যে যে সকল বিরুদ্ধ সমালোচনা হইবে, তাহার জবাব বোর্ডকে দিতে হইবে। মাধ্যমিক শিক্ষা পরিচালনা, পর্যালোচনা ও বিস্তারের জন্য যাহা করা প্রয়োজন বোধ করিবে তাহা করিবার ক্ষমতা বোর্ডের উপর অর্পিত হইবে।

সাধারণতঃ মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষৎকে নিম্নলিখিত কার্যগুলি করিতে হইবে ঃ—

(ক) মঞ্জুরি লাভ করিতে হইলে High Schoolকে কি কি শর্ত পূরণ করিতে হইবে এবং High School-এর মঞ্জুরি দিতে, মঞ্জুরি

বাতিল করিতে বা কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখিতে হইলে পর্ষতের কার্যকরী সমিতি কি কি নিয়ম মানিয়া চলিবে, পর্ষৎ তাহা নির্ধারণ করিয়া দিবে।

(খ) High School-এ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি বা তাহাদের এক স্কুল হইতে অন্য স্কুলে যাইতে হইলে কি কি নিয়ম মানিতে হইবে, তাহাও পর্ষৎ স্থির করিবে।

(গ) High School পরিদর্শন করাইয়া এবং নির্দেশ জারি করিয়া স্কুল পরিচালনা পদ্ধতি বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে।

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের যোগ্যতা নির্ধারণ করিবার উদ্দেশ্যে বা অন্য সাধারণ পরীক্ষা পরিচালনার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(ঙ) পর্ষৎ কর্তৃক পরিচালিত পরীক্ষার জন্য পরীক্ষার্থীদের কত ফি দিতে হইবে, তাহাও পর্ষৎকে ঠিক করিতে হইবে।

(চ) সরকারী সাহায্য লাভ করিতে হইলে High Schoolকে কি শর্ত পালন করিতে হইবে এবং High School-কে সাহায্য দান করিতে হইলে কি পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে, তাহাও পর্ষৎ ঠিক করিবে।

(ছ) পর্ষতের কার্যকরী সমিতি কোন High Schoolকে স্কুল ফাইনাল বা অন্য কোন পরীক্ষায় ছাত্র পাঠাইবার অনুমতি দিতে কি শর্ত আরোপ করিবে, তাহা পর্ষৎ ঠিক করিয়া দিবে।

(জ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা বা অন্য কোন পরীক্ষা দিতে হইলে পরীক্ষার্থীদের কি শর্ত পূরণ করিতে হইবে, তাহা পর্ষৎ ঠিক করিয়া দিবে।

(ঝ) আইন অনুযায়ী Provident Fund ব্যবস্থা প্রবর্তন করা এবং ইহা চালু রাখার ব্যবস্থা পর্ষৎকে করিতে হইবে।

(ঞ) মাধ্যমিক শিক্ষা তহবিলের দায়িত্ব পর্ষৎকেই গ্রহণ করিতে হইবে।

(ট) কার্যকরী সমিতির সভ্য বা পর্ষতের অন্তর্গত অন্য কোন কমিটির সভ্য নির্বাচন করিবার পদ্ধতি পর্ষৎ ঠিক করিবে।

(ঠ) কার্যকরী সমিতি বা অন্য কোন সমিতির নির্দেশের বিরুদ্ধে আপীল থাকিলে পর্ষৎ তাহার বিচার করিবে।

পর্ষৎ কর্তৃক প্রণীত কোন আইন সরকারের অনুমোদন লাভ না করিলে কার্যকরী হইবে না।

সপ্তম অধ্যায়

কারিগরী শিক্ষা (Technical Education)

কয়লা, লোহা, ম্যাঙ্গানিজ (manganese), সোনা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ্ আমাদের দেশে যথেষ্ট আছে। সেইজন্য অনেকের ধারণা, আমাদের দেশ উন্নত না হইয়া পারে না। কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদ্ থাকিলেই দেশ উন্নত হয় না এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অভাবে দেশের উন্নতি ব্যাহতও হয় না। জাপান, সুইজারল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে ভারতবর্ষের মতো যথেষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদ্ নাই বটে, কিন্তু ইহা সমৃদ্ধিশালী দেশ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে। দেশের প্রকৃত সম্পদ্ পৃথিবীর বক্ষে থাকে না ; দেশবাসীর বুদ্ধি ও কৌশলই দেশের উন্নতিবিধান করিতে পারে। আমেরিকা এখন পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী দেশ, কিন্তু দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ্ অপেক্ষা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কাজ করিবার পদ্ধতি আমেরিকার এই উন্নিতির জন্য দায়ী।

শিক্ষার একটি প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে, মানুষকে বুঝাইয়া দেওয়া তাহার মধ্যে কি ক্ষমতা অন্তর্নিহিত আছে এবং সমাজের কল্যাণের জন্য কিরূপে এই ক্ষমতা ব্যবহার করিতে হইবে। পশ্চিমের দেশগুলির সমকক্ষ হইতে গেলে বিভিন্ন শিল্পে যে সকল লোক নিযুক্ত আছে, তাহাদের উন্নত ধরনের কারিগরী শিক্ষা দিতে হইবে, যাহাতে তাহারা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি তাহাদের কাজে লাগাইতে পারে। ব্যক্তিবিশেষের শিক্ষা তখনই সার্থক হইয়াছে বুঝিতে হইবে, যখন সে পরিকল্পনা করিয়া ইহাকে বাস্তব ক্ষেত্রে রূপায়ণ করিয়া আনন্দ পায়। কারিগরী শিক্ষা মানুষের হস্ত ও মস্তিষ্ক বিকাশের সহায়তা করে।

পৃথিবীর সকল উন্নত দেশেই কারিগরী শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা

আছে। এবিষয়ে বিভিন্ন কমিশন ও কমিটি কি মন্তব্য করিয়াছেন, দেখা যাউক।

যে সময় Sadlar Commission মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যালোচনা করেন, ঠিক সেই সময় Indian Industrial Commission-ও এই দেশে Engineering শিক্ষা সম্বন্ধে পর্যালোচনা করিয়া নিম্নলিখিত সুপারিশ করেন :—

১। সাধারণতঃ ১৭ বৎসর বয়সে ছেলেরা স্কুল ছাড়িবে। যদিও ছেলের স্কুল ত্যাগ করিবার সময় তাহার শারীরিক ও মানসিক বিকাশের উপর নির্ভর করে, তথাপি একথা বলা যাইতে পারে যে, স্কুল পরিত্যাগ করিবার বয়স কমপক্ষে ১৬ এবং ঊর্ধ্বপক্ষে ১৮ বৎসরের বেশী হওয়া উচিত নহে।

২। হাতে-কলমে শিক্ষাকে (Practical Training) দুই ভাগে ভাগ করিতে হইবে। Practical Training-এর প্রথম বৎসর কোন Mechanical Engineering কারখানায় কাটাইতে হইবে।

৩। Practical Training-এর সময় ছাত্রদের সাধারণ শিক্ষানবীসের মতই নিয়মিতভাবে কাজ করিতে হইবে এবং তাহার জন্য তাহাদের বেতনও দিতে হইবে।

৪। রাত্রে পড়িবার কোন ব্যবস্থা এই সময় করা উচিত হইবে না। কারণ তাহাতে ছেলেদের উপর চাপ খুব বেশী পড়িবে।

৫। কারখানায় প্রারম্ভিক কাজ শেষ হইবার পর ছেলেদের কোন Engineering College-এ ভর্তি হওয়াই ভাল। যাহারা Mechnical Engineer হইতে চায়, তাহাদের পক্ষে Practical Training শেষ করিয়া Engineering College-এ প্রবেশ করাই ভাল। ইহাদের ক্ষেত্রে Practical Training-এর সঙ্গে সঙ্গে পড়াইবার ব্যবস্থাও করিতে হইবে ; তাহা না হইলে Practical Training-এর

সময় পড়াশুনার অভ্যাস না থাকিলে পরে তাহারা অসুবিধা ভোগ করিতে পারে।

৬। সাধারণ ছেলের পক্ষে Engineering College-এ অন্ততঃ তিন বৎসর পড়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৭। কলেজে প্রবেশ করিবার পূর্বে কারখানার কাজ করার অভিজ্ঞতা ছাড়া দুই-তিন বৎসর Practical Training-এর ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কিন্তু উপরিলিখিত সুপারিশ অনুযায়ী এই দেশে কার্য হয় না। ছেলেরা সাধারণতঃ যে বয়সে Engineering College-এ প্রবেশ করে, তাহা কমিশনের সুপারিশ করা বয়স অপেক্ষা ২।৩ বৎসর বেশী। বেশীর ভাগ কলেজেই পুঁথিগত (Theoretical) শিক্ষা শেষ হইবার পর কোন কারখানায় কিছুদিন হাতে-কলমে শিক্ষার (Practical Training) ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু Practical Training-এর জন্য যে সময় দেওয়া হয়, তাহা নিতান্তই কম এবং ইহাতে ছাত্রদের সত্যিকার উপকার বিশেষ হয় না। এই সময় ছাত্রেরা সাধারণতঃ এক কারখানা হইতে অন্য কারখানায় যায়, যন্ত্রপাতির ছবি আঁকে এবং লোকেদের কাজ করিতে দেখে, কিন্তু নিজেরা বিশেষ কোন কাজ করে না। ইহাতে ছাত্রদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসার লাভ করে সত্য, কিন্তু Engineer হিসাবে বাস্তব জীবনে ইহা কোন কাজে আসে না।

অনেকে আপত্তি করেন যে, অল্প বয়সের ছাত্রদের কল-কারখানায় কাজ করিতে দিতে এদেশের অভিভাবকেরা রাজী হইবেন না। একদিন ছিল যখন অভিভাবকেরা সত্যসত্যই এ বিষয়ে ভীষণ আপত্তি করিতেন, কিন্তু এখন কেহ আপত্তি করিবেন বলিয়া তো মনে হয় না। যাহারা Mechanical Engineer হইতে চায়, তাহাদের পড়ার সঙ্গে কারখানায়ও কাজ করিতে হইবে।

সরকারকে চিন্তা করিতে হইবে যে, Engineering College ও বিশ্ববিদ্যালয় দেশের Engineering, Technical, Technological শিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাইবার জন্য কি করিতে পারে। যত দিন যাইবে ততই Engineering, Technical ও Technological শিক্ষার চাহিদা বাড়িবে। কাজেই বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যায়ে এ-শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

Engineering ও Technological Collegeগুলি আঞ্চলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত থাকিবে এবং ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী লাভ করিতে পারিবে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত হইলেও এই কলেজগুলির স্বাধীনতা থাকিবে নিজস্ব পাঠ্য-তালিকা প্রস্তুত করিবার, বিশ্ববিদ্যালয়ের Senate-এর অধিকার থাকিবে ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী লাভ করিবার যোগ্যতার মান নির্ণয় করিবার। এই কলেজগুলির পরিচালনার ভার থাকিবে একটি পর্ষতের উপর যাহার সভ্যগণ হইবেন সরকারের শিল্প-বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিল্প ও বাণিজ্যের মালিকদের দ্বারা মনোনীত।

Hunter Commission :

১৮৮২ সালেই Hunter Commission বিভিন্নমুখী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা সরকারের নিকট সুপারিশ করিয়াছিলেন। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের একমাত্র লক্ষ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতকার্যতা লাভ করা। ইউরোপের বিদ্যালয়-গুলিতে আধুনিক দিক বলিতে যাহা বুঝায়, সে দিকটা ভারতবর্ষে একেবারেই লক্ষ্য করা হয় না। বিদ্যালয়ে এমন শিক্ষার ধারা থাকা উচিত যাহাতে প্রবেশিকা পরীক্ষার পর ছাত্রেরা শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধীয় কোন বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষাকে জীবনের কর্তব্যপালনের যোগ্যতা নির্ণয়ের উপায় বলিয়া

মনে না করিয়া, ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করিবার উপযোগী যথেষ্ট তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে কি না, বা উচ্চশিক্ষা লাভের উপযুক্ত মানসিক শক্তির বিকাশ পাইয়াছে কি না, প্রবেশিকা পরীক্ষায় তাহাই দেখা উচিত। এইরূপ অবস্থায় সরকারের বুঝা উচিত যে, বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্যে শিক্ষিত যুবকদের যোগদান করা একান্ত প্রয়োজনীয়।

১৮৮২ সালে Hunter Commission কারিগরী শিক্ষার সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন, তাহা এখনও খাটে ; কারণ কারিগরী শিক্ষার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। তাহার কারণ—

১। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার কারিগরী শিক্ষা-বিস্তারের দিকে নজর দেন নাই।

২। Technical বিষয়ে শিক্ষকদের শিক্ষণের কোন ব্যবস্থা ছিল না।

৩। শিক্ষা-বিভাগে Technical শিক্ষা সম্বন্ধে পরামর্শ দিবার জন্য কোন বিশেষজ্ঞ ছিল না, যাহার জন্য শিক্ষা-বিভাগ Technical শিক্ষা সম্বন্ধে পাঠ্য-সূচী বা পাঠ্যক্রম প্রস্তুত করিতে পারে নাই।

৪। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সংযোগ ও সহযোগিতা নাই। কতকগুলি শিক্ষা-নিকেতন শিল্পাধিকর্তার অধীনে, কতকগুলি শ্রমাধিকারের অধীনে এবং আর কতকগুলি শিক্ষাধিকারের অধীনে।

৫। টাকার অভাবে সমস্ত ভাল ভাল পরিকল্পনার রূপ দেওয়া সম্ভব হয় নাই। যদি কারিগরী শিক্ষা-নিকেতন খুলিবার সময় এবং পরবর্তী শিক্ষণ-সময়ে ন্যূনতম যোগ্য ব্যবস্থা না করা যায়, তাহা হইলে কোন রকম Technical শিক্ষার ব্যবস্থা করা নিরর্থক।

উপরোক্ত কারণে Mudaliar Commission নিম্নলিখিত সুপারিশ করিয়াছেন ঃ—

বিভিন্ন ক্ষেত্রে কারিগরী শিক্ষা-বিস্তারের সুযোগ দিতে হইবে।

উপযুক্ত শিক্ষা ও শিক্ষোপকরণের ব্যবস্থা করিয়া প্রত্যেক রাজ্যে কয়েকটি Technical School খোলা উচিত। বহুমুখী বিদ্যালয়ের অনুকরণে আদর্শ কারিগরী বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে এবং এ-বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য করা উচিত। বিশেষ করিয়া Technical School-এর জন্য শিক্ষকদের শিক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যুদ্ধাগত ব্যক্তিদের জন্য যে সকল কারিগরী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং যে সকল Polytechnical School এখন চালু রহিয়াছে, এইগুলি বিভিন্ন প্রকার কারিগরী শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

বিভিন্ন প্রকারের কারিগরী শিক্ষা ঃ

Mudaliar Commission-এর মতে চারি প্রকার ছাত্রদের জন্য কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে ঃ—

১। Higher Secondary School-এর উপরের চারি শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য।

২। যে সকল ছাত্র পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষালাভের উপযুক্ত নহে, অথবা যাহারা অভাবের তাড়নায় পড়া ছাড়িয়া দিয়া যত শীঘ্র সম্ভব অর্থ উপার্জন করিতে বাধ্য হয়।

৩। যাহারা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা শেষ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ না করিয়া Polytechnical School বা বৃত্তিমূলক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করিতে বাধ্য হয়।

৪। যাহারা কোন রকমে কারিগরী শিক্ষা শেষ করে, কিন্তু সন্ধ্যায় পড়াশুনা করিয়া তাহাদের কর্মজীবনে উন্নতি করিতে চাহে।

প্রথম প্রকারের ছাত্রদের শিক্ষার ব্যবস্থা কারিগরী উচ্চ বিদ্যালয় (Technical High School) বা বহুমুখী বিদ্যালয় (Multipurpose Higher Secondary School)-এ করা যাইতে পারে। সাধারণ বিদ্যালয়ের সঙ্গে এই বিদ্যালয়ের পার্থক্য হইতেছে এই যে, ভাষা,

বিজ্ঞান, গণিত, সামাজিক পাঠ প্রভৃতি সাধারণ পাঠ্য-বিষয় ছাড়া এখানে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পড়াইবার ব্যবস্থা থাকিবে ঃ—(১) ফলিত গণিত ও জ্যামিতির অঙ্কন, (২) কারখানার প্রারম্ভিক কাজ, (৩) Mechanical ও Electrical Engineering-এর কিছু কিছু অংশ। এই সকল বিদ্যালয়ের লক্ষ্য হইতেছে, শিশুদের সমস্ত প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করিবার কৌশল শিখানো। যাহাতে উপযুক্ত ছাত্রেরা এই দিকে আসিতে পারে তাহার জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মতই ছাত্র বাছাই করিয়া লইতে হইবে এবং মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে School Leaving Certificate পরীক্ষার ন্যায় ব্যবস্থা করিতে হইবে।

দ্বিতীয় প্রকার ছাত্রেরা শিল্প বা বাণিজ্য বিষয়ক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করিবে। এখানে Mechanical Engineering, Electrical Engineering এবং এই জাতীয় অনুরূপ কারিগরী শিক্ষা দেওয়া হইবে। এই সকল স্কুলে দুই বৎসর পড়িবার ব্যবস্থা থাকিবে এবং পাঠ শেষ করার পর Certificate দেওয়া হইবে।

তৃতীয় প্রকার ছাত্রেরা Technical School বা Engineering College-এ পড়িবে। এখানে সাধারণতঃ তিন বৎসর পড়ার ব্যবস্থা থাকিবে। পড়া শেষ হইলে Diploma দেওয়া হইবে।

চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী, কিন্তু তাহাদের শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই আমাদের দেশে এখন নাই বলিলেই চলে।

যদি সকল ছাত্র জানিত যে, তাহারা অবসর সময়ে যে-কোন প্রকার কারিগরী শিক্ষা পাইতে পারে, তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের জন্য এত ভিড় হইত না। অনেকেই দিনের বেলায় কাজ করিয়া যদি সন্ধ্যাবেলায় কোন-না-কোন প্রকার technical বিষয়ে শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ পাইত, তাহা হইলে উপার্জন করা ও শিক্ষা করা একই সঙ্গে চলিতে পারে।

বর্তমান অবস্থায় শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাবের কথা চিন্তা করিয়া Mudaliar Commission সুপারিশ করিয়াছেন যে, বড় বড় শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বিদ্যালয়গুলিকে নানা কাজে ব্যবহার করিতে হইবে। High School বা Higher Secondary School-এ যাহারা বিভিন্নমুখী (diversified) শিক্ষালাভ করিবে, তাহারা এই কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে কারিগরী শিক্ষালাভ করিবে এবং অন্যান্য পুঁথিগত বিষয় সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে পারিবে। কাছাকাছি বিদ্যালয়গুলি কেন্দ্রীয় Technical School-এ ছাত্র পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া কারিগরী শিক্ষার সুযোগ লাভ করিতে পারে। দেশে বহুমুখী বিদ্যালয়-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা তাহাদের ক্ষমতা ও রুচি অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ পাইবে এবং কারিগরী শিক্ষারও অধিকতর সুযোগ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

শিল্পের জন্য কারিগরদের শিক্ষা (Training of Craftsmen in Industry) :

শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষানবীসদের শিক্ষার ব্যবস্থাও করা দরকার। কোন চালু শিল্প-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবীসদের প্রকৃত শিক্ষা-লাভ হয়। Technical School-এ শিক্ষানবীসরা যে বাস্তব জ্ঞান লাভ করে, তাহার পরিপূরক হিসাবে পুঁথিগত সাধারণ কারিগরী জ্ঞান দান করা হইবে। কোন কারখানাতে শিক্ষানবীস-শিক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে Technical School-এ সাধারণ কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেই তবে প্রকৃত বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হইবে।

এই সম্বন্ধে Mudaliar Commission নিম্নলিখিত সুপারিশ করিয়াছেন :—

১। প্রত্যেক শিল্প-প্রতিষ্ঠানেই ১৪ বৎসরের উর্ধ্ব বালকদের জন্য সুপরিকল্পিত শিক্ষানবীসী-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে হইবে।

২। মাধ্যমিক স্তরে যে সকল Technical School থাকিবে, সেগুলি শিক্ষানবীসদের জন্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সংলগ্ন থাকিবে। Technical School-এ প্রত্যেক শিক্ষানবীসের প্রয়োজনীয় কারিগরী জ্ঞান দিবার সঙ্গে সঙ্গে অবসর সময়ে সাধারণ জ্ঞান দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিক্ষানবীসী ও কারিগরী শিক্ষা বিশেষ বিশেষ শিল্পের প্রয়োজন অনুসারে ৪।৫ বৎসর ধরিয়া চলিতে থাকিবে। ১৮।১৯ বৎসর বয়সে একটি ছেলে সাধারণ জ্ঞান ও কারিগরী জ্ঞান লাভ করিয়া বাহির হইলে তাহার কর্ম-সংস্থান করা আদৌ কঠিন হইবে না।

শিক্ষানবীসী-শিক্ষণ (Apprenticeship Training) :

শিল্প-প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে চালাইবার একটি পদ্ধতি হইল যাহাদের হাতে-কলমে শিক্ষা নাই, তাহাদের কল-কব্জা ব্যবহার করিতে না দেওয়া। কোন কল ভালভাবে চালাইতে হইলে কোন বিশেষজ্ঞের নিকট শিক্ষা লাভ করা দরকার। সকল প্রকার কারিগরের পক্ষেই বিশেষজ্ঞের নিকট হাতে-কলমে শিক্ষালাভ করাই সবচেয়ে ভাল শিক্ষা। অনেক দেশেই প্রত্যেক শিল্প-প্রতিষ্ঠানে আবশ্যিকভাবে শিক্ষানবীসী গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। কোন কোন দেশে আইন প্রণয়ন করিয়া শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাধ্য করা হয় ২।১ দিন শিক্ষানবীসদের ছুটি দিতে, যাহাতে তাহারা নিকটবর্তী কোন Technical School-এ পড়িবার সুযোগ পায়। আবার কোন কোন দেশে Technical School-এর ছাত্রদের যাহাতে সংশ্লিষ্ট শিল্প-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবীসী হিসাবে গ্রহণ করা হয় এবং প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, সেজন্য আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে। দূরদর্শী শিল্পপতিরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন যে, শিক্ষানবীসদের ভালভাবে শিক্ষা-ব্যবস্থা করিলে তাঁহাদের কাজের কোন ক্ষতি হইবে না, বরং তাঁহাদের শিল্প-পরিচালনার জন্য উপযুক্ত কর্মী পাইবার সুবিধা হইবে।

বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুবিধা হয় যদি কতকগুলি ছাত্রকে মাধ্যমিক বিদ্যালয় বা Technical School হইতে সরাসরি কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবীসী হিসাবে গ্রহণ করা হয়। ইহাতে ছেলেরা কারখানায় যে কারিগরী জ্ঞান লাভ করিয়াছে, তাহা কাজে লাগাইতে পারিবে এবং অল্প বয়সে নিজের বুদ্ধিবৃত্তি ও অন্তর্নিহিত ক্ষমতা বিকাশ করিবার সুযোগ লাভ করিবে। যদি শিক্ষার শেষে শিল্প-প্রতিষ্ঠানে কর্ম-সংস্থানের আশা থাকে, তাহা হইলে ছাত্রেরা খুব আগ্রহের সহিত Technical School-এর পাঠ শেষ করিবে।

Mudaliar Commission সুপারিশ করিয়াছেন যে, দেশে এরূপ আইন পাস করিতে হইবে যাহাতে প্রত্যেক শিল্প-প্রতিষ্ঠান আবশ্যিকভাবে শিক্ষানবীস গ্রহণ করে। কিন্তু যদি শিল্পপতিরা স্বতঃ-প্রণোদিত হইয়া Technical School-এর সহিত সহযোগিতা করেন, তাহা হইলে ফল ভাল হইবে বলিয়া আশা করা যায়। Technical বা Technological School স্থাপন করিবার সময় শিল্প ও বাণিজ্য সংস্থার প্রতিনিধিদের সহযোগিতা লাভ করিবার চেষ্টা করা উচিত।

All India Council for Technical Education :

কারিগরী শিক্ষা পরিচালনা করিবার জন্য ভারত সরকার All-India Council for Technical Education নামে একটি সংস্থা স্থাপন করিয়াছেন। বর্তমানে এই সংস্থা High School-এর উত্তীর্ণ ছাত্রদেরই কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষা-পরামর্শদাতা পর্ষৎ (Central Advisory Board of Education) কারিগরী শিক্ষা-বিস্তার বিষয়ে যে পরামর্শ দিয়াছেন, তাহা রূপায়িত করিবার ভার পড়িয়াছে রাজ্য সরকারের উপর। ভারতের সর্বত্র কারিগরী শিক্ষার মান যাহাতে একই রকমের হয়, সেইজন্য সমস্ত

Technical School-ই All-Indial Council of Education-এর পরিচালনাধীনে থাকা উচিত।

All-India Council for Technical Education-এর অধীনে নিম্নলিখিত Board of Studies আছে :—

(*a*) Engineering and Metallurgy.

(*b*) Chemical Engineering and Chemical Technology.

(*c*) Textile Technology.

(*d*) Architecture and Regional Planning.

(*e*) Applied Art.

(*f*) Commercial and Business Administration.

এই বোর্ডগুলি পাঠ্য-স্থচী এবং বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষার নিয়মাবলী প্রস্তুত করিয়াছেন :—

(*a*) বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রী পরীক্ষার সমপর্যায়ে।

(*b*) পরিদর্শকদের শিক্ষার জন্য।

মাধ্যমিক শিক্ষা-স্তরের পাঠ্য-স্থচীর সহিত Board of Studies কর্তৃক প্রস্তুত পাঠ্য-স্থচীর সংযোগ রক্ষা করিতে পারিলে ভাল হয়। যে সমস্ত ছেলে Engineering ও Technology ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে গ্রহণ করিবে, তাহারা মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করিয়া Higher Technical Institution-এ ভর্তি হইবে, অথবা কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবীস হইয়া অবসর সময়ে পড়াশুনা করিবে।

নিম্নলিখিত প্রতিনিধিদের লইয়া Board of Technical Studies গঠিত হইয়াছে :—

(*a*) Technical Institution-এর অধ্যক্ষ-সম্মিলনের প্রতিনিধি।

(*b*) আন্তর্বিশ্ববিদ্যালয় পর্ষতের প্রতিনিধি।

(*c*) সংশ্লিষ্ট বৃত্তি-পর্ষতের প্রতিনিধি।

(*d*) শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতিনিধি।

(*e*) Council of Technical Education পরিচালিত পরীক্ষায় যে সমস্ত শিক্ষা-নিকেতন হইতে ছাত্র আসে, তাহাদের প্রাতনিধি।

ইহা ছাড়াও Council of Technical Education-এর সংযোগ-স্থাপনকারী পর্ষৎগুলির চারিজন মনোনীত সভ্য এবং বোর্ড কর্তৃক মনোনীত তিনজন সভ্যও এই বোর্ডে থাকিবেন। যাঁহারা মাধ্যমিক শিক্ষার সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন এই রকম ব্যক্তি যাহাতে এই বোর্ডের সভ্য থাকিতে পারেন, সে ব্যবস্থাও করিতে হইবে। Council of Technical Education-এর অন্তর্ভুক্ত Board of Studies মাধ্যমিক স্তরের technical বিষয়ের পাঠ্য-সূচী সম্বন্ধে পরামর্শ দিবেন।

মাধ্যমিক স্তরে বহুমুখী শিক্ষাধারা প্রবর্তিত হইলে এবং Junior Technical Institution স্থাপিত হইলে শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্রেরা যাহাতে হাতে-কলমে কাজ করিবার সুযোগ পাইতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যে সকল ছাত্র High School-এর পাঠ শেষ করিয়া আসিবে এবং যাহারা Senior Basic School-এর পাঠ শেষ করিয়া আসিবে—এই উভয় প্রকার ছাত্রেরা যাহাতে শিল্প-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবীস হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। Council of Technical Education-এর আঞ্চলিক সমিতি শিল্প-প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন শিক্ষা-নিকেতন এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিবে। এই সকল আঞ্চলিক সমিতিতে রাজ্য সরকার, শিল্প, বাণিজ্য ও শ্রম, বিশ্ববিদ্যালয়, Technical Institution, Institute of Engineers-এর সহযোগী সভ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি এই বোর্ডে থাকিবেন।

বিভিন্ন প্রকারের স্কুল ঃ

(ক) **Public School ঃ**

ভারতে Public School খুব বেশীদিন স্থাপিত হয় নাই। এখন পর্যন্ত সারা ভারতে চৌদ্দটি Public School আছে; ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি স্কুল আছে যেখানে Public School-এর অনুকরণে কাজ হয়। ইংলণ্ডের Public School-এর পদ্ধতি ভারতীয় Public School গুলি মোটামুটি অনুসরণ করে।

ভারতবর্ষে Public School-এর প্রয়োজনীয়তা আছে কি না, সে সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। অনেকের মত যে, গণতান্ত্রিক রাজ্যে Public School থাকা উচিত নয়; Public School দেশের উন্নতির জন্য উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু করে নাই; Pubilc School-এর ছাত্রেরা হয় সংকীর্ণচেতা এবং গণতান্ত্রিক সমাজে নিজেদের মানাইয়া লইতে পারে না। Public School-এর বিরুদ্ধে একথা বলা হয় যে, এই স্কুলে পড়ানো ব্যয়সাধ্য। সেইজন্য কেবল বড়লোকের ছেলেরাই এখানে পড়িবার সুযোগ পাইবে। তাহার ফলে বড়লোক ও গরীবলোক এই শ্রেণীভেদ থাকিয়াই যাইবে। আবার Public School-এর পক্ষে ওকালতি করিবার লোকেরও অভাব নাই। ভারতসরকারের ভূতপূর্ব শিক্ষোপদেষ্টা স্যার জন সার্জেন্ট Public School সম্বন্ধে নিম্ন প্রকার মন্তব্য করিয়াছেন ঃ "Public School হইতে যে-সব ছেলে বাহির হয়, তাহারা খুব বুদ্ধিমান্ না হইতে পারে, তাহাদের আচার-ব্যবহার দাম্ভিক হইতে পারে, কিন্তু নিয়মানুবর্তিতা, দায়িত্ব গ্রহণ করিবার ক্ষমতা এবং দেশের নেতৃত্ব করিতে হইলে যে-সব গুণের দরকার তাহা Public School-এর ছাত্রেরা অর্জন করে।"

Public School-এর পক্ষে ও বিপক্ষে সমালোচনা সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া Mudaliar Commission সুপারিশ করিয়াছেন যে, ঠিক

ভালভাবে চালাইলে Public School-এর ছেলেরা স্থনাগরিক হইবার গুণাবলী অর্জন করিতে পারিবে। সাধারণ মাধ্যমিক বিদ্যালয় অপেক্ষা এখানকার ছেলেরা শিক্ষকদের অধিকতর সান্নিধ্যে আসিতে পারে এবং নানা বিষয়ে স্থযোগ লাভ করে; সেইজন্য Public School-এর ছেলেদের চরিত্রে কতকগুলি বিশেষ গুণের সমাবেশ দেখা যায় এবং সহজেই তাহারা সমাজে নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে পারে।

গত বিশ্ব-যুদ্ধে দেখা গিয়াছে যে, যাঁহারা সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব করিয়াছেন তাঁহারা বিভিন্ন প্রকার বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছেন। অতএব Public School-এ যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, সকল বিদ্যালয়ে সেই প্রথা প্রবর্তন করা উচিত। কিন্তু সাধারণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে রাতারাতি উন্নত করা সম্ভব নহে। সেইজন্য আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় Public School-এর স্থান এখনও আছে, একথা অস্বীকার করা যায় না।

কিন্তু Public School চালাইতে হইলে কয়েকটি নীতির কথা স্মরণ রাখিতে হইবে:—

১। Public School সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শিক্ষা-নিকেতন হইবে না। দেশের মাটির সঙ্গে ইহার যোগ থাকিবে এবং দেশের চল্‌তি শিক্ষা-ব্যবস্থার সহিত ইহার সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইবে।

২। Public School-এ কেবল ক্রীড়াপ্রিয়তার দিকে লক্ষ্য রাখিলেই চলিবে না, নাগরিকের অন্যান্য গুণ, শ্রমের মর্যাদা এবং সামাজিকতা যাহাতে বিকাশ পায়, সেদিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তাহা ছাড়া, এখানকার পরিবেশ ভারতীয় ভাবধারা ও সংস্কৃতির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে।

যত দিন যাইবে ততই Public Schoolগুলিকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের অর্থসাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা কমাইতে হইবে এবং ক্রমশঃ

আত্মনির্ভরশীল হইতে হইবে। যেহেতু Public School বিশেষ বিদ্যালয় এবং বড়লোকের ছেলেরাই এখানে পড়িবে, সেইজন্য ইহা সাধারণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মত সরকারী সাহায্য আশা করিতে পারে না। Doon School-এর মত কয়েকটি Public School আত্মনির্ভরশীল হইয়াছে, কিন্তু বেশীর ভাগ Public School-এর অবস্থা এমন যে, সরকারী সাহায্য বন্ধ করিলে স্কুলগুলি হয়তো উঠিয়া যাইবে। অতএব পাঁচ বৎসর ধরিয়া ক্রমে ক্রমে Public School-এর অর্থসাহায্য কমাইয়া পাঁচ বৎসর পরে অর্থসাহায্য দেওয়া একেবারে বন্ধ করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় সরকারকে কতকগুলি মেধাবী গরীব ছাত্রের Public School-এ পড়িবার সমস্ত খরচ দিতে হইবে।

(খ) আবাসিক বিদ্যালয় (Residential School) :

মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় আবাসিক বিদ্যালয়ের বিশেষ স্থান আছে। যে পরিবেশে গৃহ, বিদ্যালয় ও সমাজ সমানভাবে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, সেখানেই কৈশোর পর্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা সবচেয়ে ভাল। দুর্ভাগ্যক্রমে সকল বাড়ীতে এবং সকল অভিভাবক শিশুদের শিক্ষার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারেন না। অনেক সময় দেখা যায় যে, চাকুরে পিতার ঘন ঘন এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় বদলি হওয়া বা বহুদিন দূরে থাকার জন্য ছেলের পড়াশুনার অসুবিধা হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে আবাসিক বিদ্যালয়ে ছেলেদের পাঠানো ছাড়া উপায় থাকে না। এখন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়; কাজেই যে সকল অভিভাবক কার্য উপলক্ষে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বদলী হন, তাঁহাদের পক্ষে ছেলেদের সব সময় সঙ্গে রাখাও সম্ভব হয় না। আবাসিক বিদ্যালয় না থাকিলে সৈন্যবাহিনীতে বা বৈদেশিক দূতাবাসে যাঁহারা কাজ করেন, তাঁহাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখানো খুবই অসুবিধাজনক হইবে। পল্লী-

অঞ্চলে বহুমুখী শিক্ষাধারাযুক্ত High School অথবা Higher Secondary School প্রতিষ্ঠিত হইলে বিদ্যালয়ে ছেলেদের থাকিবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হইবে। দৈনন্দিন স্কুল (Day School) অপেক্ষা আবাসিক বিদ্যালয়েই ছেলেরা সামাজিক ব্যবহার, দলবদ্ধ-ভাবে বাস করিবার শিক্ষা এবং খেলাধূলা প্রভৃতি পাঠ্যবহির্ভূত কার্য করিবার সুযোগ পায়। আবাসিক বিদ্যালয়ে কয়েকজন শিক্ষকেরও থাকা দরকার, যাহাতে শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপিত হয়। শিক্ষকদের সংস্পর্শে আসিলে গৃহের প্রভাব ও পরিবেশের অভাবও খানিকটা দূর হইবে।

ইহা ছাড়া, আর এক প্রকার আধা-আবাসিক বিদ্যালয় হইতে পারে। এখানে ছেলেরা সকাল ৮টার সময় আসিবে এবং সন্ধ্যা ৬টার সময় বাড়ী যাইবে। এই প্রকার স্কুলের সুবিধা এই যে, ছেলেরা দিনের বেশীর ভাগ সময় স্কুলের সুবিধা ভোগ করিতে পারিবে। যেমন—স্কুলের পাঠাগার ব্যবহার করিতে পারিবে, শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে পড়াশুনা করিতে পারিবে এবং পাঠ্যবহির্ভূত নানা রকম কাজ করিবার সুযোগ পাইবে। তাহা ছাড়া, এই জাতীয় স্কুলে শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া উঠিবে। এই প্রকার আবাসিক বিদ্যালয়ে ছেলেদের দুপুরে খাওয়ার ব্যবস্থা এবং বিকালে সামান্য রকমের জলখাবারের ব্যবস্থাও করিতে হইবে। টাকা-পয়সার অভাবে বিনা পয়সায় ছেলেদের দুপুরের খাবার ও বিকালের জল-খাবার দেওয়া সম্ভব হইবে না, কিন্তু যদি সমবায়-পদ্ধতিতে অল্প খরচে এবং শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে খাবার দেওয়া হয়, তাহা হইলে অনেক ছেলেই এই সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিবে। স্কুলে এমন জায়গা থাকা দরকার যেখানে দুপুরবেলায় ছেলেরা বিশ্রাম করিতে পারিবে। শিল্পাঞ্চলে যেখানে গরীব বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের বাস

এবং যাহাদের বাড়ীতে স্বাস্থ্যপ্রদ পরিবেশের অভাব, সেখানে এই প্রকার বিদ্যালয়ের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

বিকলাঙ্গদের শিক্ষা ঃ

ভারতবর্ষে অন্ধ, বোবা ও কালাদের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। এই সকল বিকলাঙ্গ শিশুদের জন্য এখন সমগ্র ভারতে মাত্র কয়েকটি বিদ্যালয় আছে। তাঁত-বোনা, ঝুড়ি-বোনা, কাঠের কাজ, সঙ্গীত প্রভৃতি অর্থকরী বৃত্তি অন্ধদের বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। ভারত সরকার সমস্ত অন্ধ বিদ্যালয়ে ব্যবহারের জন্য Braile সাঙ্কেতিক অক্ষর বাহির করিবার উদ্দেশ্যে অর্থের বরাদ্দ করিয়াছেন। বিকলাঙ্গদের বিদ্যালয় হইবে আবাসিক। এখানে শিশুদের কয়েক বৎসর রাখিতে হইবে, যাহাতে তাহারা কোন বৃত্তি শিক্ষা করিয়া স্বাবলম্বী হইতে পারে।

ইহা ছাড়া, আমাদের দেশে যক্ষারোগগ্রস্ত বা অন্য রকম কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত ছেলেমেয়ের সংখ্যাও কম নহে।

Mudaliar Commission-এর মতে এই সকল ছেলেমেয়ের জন্য খোলা জায়গায় বিদ্যালয় খুলিতে হইবে। সেখানে তাহাদের শিক্ষা ও চিকিৎসা একসঙ্গেই চলিবে।

বাড়তি শ্রেণী (Continuation Class) ঃ

ভারতীয় সংবিধানে বলা হইয়াছে, আট হইতে চৌদ্দ বৎসর বয়স্ক সমস্ত বালক-বালিকার শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, কিন্তু এখন কিছুদিন ইহা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। অনেক ছেলেমেয়েই এগার বৎসর বয়সে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়া বিদ্যালয় ছাড়িয়া দিবে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বৃত্তিমূলক বিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে পারে, কিন্তু বেশীর ভাগ ছেলেমেয়ের আর পড়াশুনা করিবার সুযোগ হইবে না। এগার হইতে চৌদ্দ বৎসর শিশুর জীবনে অতি গুরুত্বপূর্ণ

সময়। এই সময় তাহাদের কোন-না-কোন শিক্ষায়তনের সংস্পর্শে থাকা উচিত। ইহাদের জন্য অবসর সময়ে আংশিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। Junior High বা High School-এ নিয়মিত কাজের পর এগার হইতে চৌদ্দ বৎসরের ছেলেমেয়েদের পড়ার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বা বে-সরকারী সমিতির এই বিষয়ে আগ্রহশীল হইতে হইবে। এই বাড়তি শ্রেণীর (Continuation Class) জন্য বিশেষ করিয়া পাঠ্য-সূচী প্রস্তুত করিতে হইবে।

এ বিষয়ে International Team কি মন্তব্য করিয়াছেন, দেখা যাউক :—

পাশ্চাত্ত্য দেশে প্রায় সকল স্থানে বাধ্যতামূলক শিক্ষার বয়স উত্তীর্ণ হওয়ার পরও অতিরিক্ত শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আংশিক বা সম্পূর্ণ শিক্ষা-ব্যবস্থা ছাড়া অতিরিক্ত শিক্ষার জন্য আবাসিক বিদ্যালয়ও আছে। সাধারণ স্কুলের গৃহেই সন্ধ্যার সময় অতিরিক্ত শ্রেণীর কাজ হইয়া থাকে এবং সাধারণ স্কুলের শিক্ষকেরাই এখানে পড়ান এবং তাহার জন্য অতিরিক্ত বেতন পান। এই সব সান্ধ্য শ্রেণীতে সাংস্কৃতিক শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা উভয় প্রকার ব্যবস্থাই আছে। এই প্রকার সান্ধ্য বিদ্যালয়ের সুন্দর দৃষ্টান্ত ডেনমার্কে দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে সাত বৎসরের বাধ্যতামূলক শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু আছে; কিন্তু জনসাধারণের চেষ্টায় অতিরিক্ত শ্রেণীর যথেষ্ট প্রসার দেখা যায়। সাংস্কৃতিক বা বৃত্তিমূলক উভয় প্রকার অতিরিক্ত শ্রেণীর জন্য সরকার হইতেও প্রচুর সাহায্য পাওয়া যায়। এইজন্য International Team সুপারিশ করিয়াছেন যে, সমস্ত বয়সের ছেলেমেয়ে, এমন কি বয়স্কদের জন্য নানা বিষয়ে অতিরক্ত পাঠের ব্যবস্থা করা রাজ্য-সরকারের উচিত।

অষ্টম অধ্যায়

(১) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য-সূচী

(The Curriculum in Secondary Schools)

বহুদিন হইতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের চল্‌তি পাঠ্য-সূচী সম্বন্ধে চারিদিক হইতে নানারকম বিরুদ্ধ সমালোচনা করা হইয়াছে। পাঠ্য-সূচী সম্বন্ধে মোটামুটি নিম্নলিখিত বিষয়ে সমালোচনা করা হইয়াছে :—

১। বর্তমান পাঠ্য খুব সংকীর্ণ।

২। ইহা পুঁথিপ্রধান এবং বাস্তবতাবর্জিত।

৩। পাঠ্য-সূচী খুবই দীর্ঘ, কিন্তু ইহার মধ্যে সারবস্তু খুব বেশী নাই।

৪। ব্যক্তিত্ব বিকাশ করিতে হইলে যে সকল বাস্তব কার্যাবলীর প্রবর্তন করা উচিত, এই পাঠ্য-সূচীতে তাহার কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই।

৫। কৈশোরের প্রয়োজন ও শক্তির দিকে লক্ষ্য রাখা হয় নাই।

৬। পরীক্ষা পাসের প্রয়োজনীয়তা দ্বারা পাঠ্য-সূচী প্রভাবিত হইয়াছে।

৭। দেশের শিল্প ও অর্থনৈতিক বিষয়ে অংশ গ্রহণ করিতে হইলে কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রয়োজন, কিন্তু কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা পাঠ্য-সূচীতে স্থান পায় নাই।

উপরিলিখিত সমালোচনাগুলির মধ্যে যে যুক্তি আছে, একথা অস্বীকার করা যায় না। কোন কোন সমালোচক বলিয়াছেন যে, বর্তমানে পাঠ্য-সূচীর কোন উদ্দেশ্য নাই; কিন্তু তাহা সত্য নহে। তবে একথা বলা যায় যে, ছেলেমেয়েদের কলেজে ভর্তি করিবার প্রয়োজনের দিকেই লক্ষ্য করিয়া পাঠ্য-সূচী প্রস্তুত করা হইয়াছে।

এই ত্রুটি দূর করিবার জন্য মাঝে মাঝে চেষ্টা হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও ইহা দূর করা সম্ভব হইয়া উঠে নাই। High School-এর শেষে যে পরীক্ষা হয়, তাহাকে এক সময় বলা হইত Entrance Examination (প্রবেশিকা পরীক্ষা)—ইহা হইতে পাঠ্যসূচীর উদ্দেশ্য বুঝা যাইবে। পরে এই পরীক্ষার নাম হইল Matriculation Examination; ইহাতে কিন্তু প্রায় একই কথা বিভিন্নভাবে বলা হইল। Matriculation কথার অর্থ হইতেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের নাম রেজিস্টারী করা। বর্তমানে এই পরীক্ষার নাম হইয়াছে School Leaving Certificate বা Secondary School Examination; পরীক্ষার নাম পরিবর্তন দ্বারা অন্ততঃ মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য পরিবর্তনই সূচনা করিতেছে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে সত্যকার কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। যে সকল ছেলে School Final পরীক্ষা দেয়, তাহাদের অধিকাংশই কলেজে ভর্তি হইতে চায়। যাহারা কলেজে ভর্তি হয় না তাহারা কেবল অর্থের অভাবেই মনের ইচ্ছা সফল করিতে পারে না। কলেজীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাই এখনও মাধ্যমিক শিক্ষাকে প্রভাবান্বিত করে। এইজন্যই High School-এর পাঠ্য-সূচী কলেজের পাঠ্য-সূচীর সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া রচনা করা হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর উপর সরকারী চাকুরি নির্ভর করে বলিয়া মাধ্যমিক শিক্ষার উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাব বিস্তার করা হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী না থাকিলে কোন ভাল চাকুরি পাওয়া সম্ভব নহে।

পুঁথিগত বিদ্যা (Bookish Knowledge)ঃ

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য-সূচী কলেজীয় পাঠ্য-সূচী দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে বলিয়াই ইহা পুঁথিপ্রধান ও অবাস্তব। আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-সূচী স্বভাবতঃ পুঁথিপ্রধান ও অবাস্তব এবং ইহা শ্রেণী বা

গোষ্ঠী-বিষয়ক সাধারণ তথ্য লইয়া (Abstraction and Generalisation) আলোচনা করে। কিন্তু উচ্চ বিত্যালয় স্তরে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হইবে অন্য রকম। বস্তুবহির্ভূত সাধারণ তথ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিবার মত বুদ্ধির বিকাশ উচ্চ বিত্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের হয় না। তাহা ছাড়া, High School-এ যে সকল ছাত্র-ছাত্রী পড়ে তাহাদের সকলের পড়ুয়া মনোভাব নাই এবং অনেকে বিশ্ববিত্যালয় পর্যন্ত হয়তো যাইবে না। High School-এর বেশীর ভাগ ছাত্র-ছাত্রীই মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে সংসারের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে। সংকীর্ণ পুঁথিগত পাঠ্য-সূচী ছাত্র-ছাত্রীদের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পাথেয় কিছুই দিতে পারে না। তাহাদিগকে নানারকম মানসিক ও শারীরিক এবং বাস্তব ও সামাজিক কাজে অংশ গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু পুস্তককেন্দ্রিক শিক্ষায় ইহা সম্ভব নহে। গত অর্ধ-শতাব্দীতে শিক্ষাবিদ্‌রা এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন এবং সেই জন্যই পাঠ্য-সূচী পরিবর্তন করিবার জন্য আগ্রহ দেখা দিয়াছে। শিক্ষায় উন্নত দেশগুলিতে মাধ্যমিক বিত্যালয়ের পাঠ্য-সূচীকে এত ব্যাপকভাবে ধরা হইয়াছে যে, শিশুর শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিগত প্রভৃতি সর্বাঙ্গীণ বিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য মাধ্যমিক বিত্যালয়ে নানা রকম কার্য ও অভিজ্ঞতার সুযোগ ছাত্র-ছাত্রীদের দিতে হইবে। শিশুকে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিবার বাস্তব শিক্ষা দিতে হইবে এবং কিরূপে সমাজ গঠিত ও চালিত হয়, তাহারও অভিজ্ঞতা অর্জন করিবার সুযোগ দিতে হইবে। সাধারণতঃ অভিযোগ করা হয় যে, বর্তমানে পাঠ্য-সূচী খুব বেশী ভারাক্রান্ত,—শিশুদের নানা বিষয় পাঠ করিতে হয়। বর্তমান পাঠ্য-সূচী হইতে যতটা সম্ভব পঠনীয় বিষয় কমাইতে হইবে। বিভিন্ন বিষয় পরস্পরবিচ্ছিন্ন ও সম্বন্ধবিহীনভাবে পড়ানো হয় বলিয়াই

পাঠ্য-স্থচীকে এত ভারাক্রান্ত মনে হয়। পাঠ্য-স্থচী প্রস্তুত করিবার সময় কতকগুলি পরস্পর-সম্বন্ধযুক্ত বিষয়কে একই পর্যায়ভুক্ত করিতে হইবে। ইতিহাস, ভূগোল, নাগরিক ও ধন-বিজ্ঞান (History, Geography, Civics and Economics) পরস্পর-সম্বন্ধবিহীন বিভিন্ন বিষয় হিসাবে না পড়াইয়া Social Studies (পরিবেশ-পরিচিতি) নামে একটি বিষয় হিসাবে গণ্য করা উচিত। কারণ ইহারা সামাজিক পরিবেশ ও মানবসমাজ সম্বন্ধেই বর্ণনা করে। সাধারণ বিজ্ঞান এই নাম দিয়া একটি পাঠ্য-বিষয় করা উচিত যাহার মধ্যে সেই সব বিষয় থাকিবে যাহাতে সামাজিক পরিবেশ এবং প্রকৃতির সহিত মানুষের সম্বন্ধ কি, তাহা আলোচনা করা হইবে। Physics, Chemistry, Botany, Zoology, Hygiene প্রভৃতি বিষয় পৃথক ভাবে পড়ানোর কিছু উপকারিতা আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা দ্বারা শিশুরা বুঝিতে পারে না যে, প্রকৃতির বিভিন্ন বিভাগ পরস্পর-সম্বন্ধ-যুক্ত। কোন বিষয়কে কতকগুলি ঘটনা ও তথ্যের সমষ্টি মনে না করিয়া প্রকৃতির যে-কোন একটা দিকে রেখাপাত করিবার নিমিত্ত একটি দ্বারস্বরূপ মনে করা উচিত। যদি এই দুইটি দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য সম্বন্ধে আমরা সজাগ থাকি, তাহা হইলে পাঠ্য-স্থচী প্রস্তুত করা এবং পাঠদান করার যথার্থ পদ্ধতি নির্ণয় করাও সহজ হইবে। তাহা ছাড়া, শিশুরা যে সকল বিষয় পড়িবে সেই সম্বন্ধে যদি কোন কাজ করিবার স্থযোগ পায়, তাহা হইলে কাজে তাহাদের বিরক্তি আসিবে না। যেমন—গবেষণাগারে কাজ করিবার স্থযোগ পাইলে বিজ্ঞান পাঠ করিতে শিশুদের বিরক্তিবোধ হইবে না।

প্রায়ই দেখা যায় যে, কোন বিষয়ের পাঠ্য-স্থচীর মধ্যে অনেক বেশী ঘটনার সন্নিবেশ করা হয় এবং সেগুলি আবার বিস্তারিত-ভাবে বর্ণনা করা হয়। কিন্তু স্মৃতিশক্তির উপর অকারণ চাপ

দেওয়া ছাড়া ইহাদের কোন সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। পাঠ্য-স্থচী বিচার ও পুনর্গঠন করিবার জন্য যে Committee গঠন করা হয়, সেই Committee-এর সভ্যবৃন্দ অনেক সময় পাঠ্য-বিষয়ের সার্থকতা ও উপযুক্ততার দিক হইতে বিচার না করিয়া নূতন নূতন ঘটনার সন্নিবেশ করিয়া থাকেন। যেমন উচ্চ প্রাথমিক, নিম্ন মাধ্যমিক ও বুনিয়াদী স্তরের ইতিহাসের পাঠ্য-স্থচীতে প্রাচীনকালের অর্ধ-বিস্মৃত ব্যক্তি ও ঘটনার সন্নিবেশ করা হইয়াছে। ইহার যুক্তি দেখানো হয় যে, পুরাতন কালের ঘটনার সহিত পরিচয় হইলে শিশুদের মানসিক উৎকর্ষ সাধিত হইবে এবং ইতিহাস-পাঠে তাহাদের আগ্রহ জন্মিবে। যাহাতে ছাত্রদের বোধশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং তাহাদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজে লাগে, তাহাকেই উপযুক্ত পাঠ্য-স্থচী বলা যাইতে পারে। Mudaliar Commission স্থপারিশ করিয়াছেন যে, প্রত্যেক রাজ্যে ও কেন্দ্রে পাঠ্য-স্থচী সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য একটি Board বা Bureau প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ ও পরিবর্তনশীল সমাজের প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পাঠ্য-স্থচী সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করাই হইবে এই Bureau-র কাজ। Bureau-র সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করিয়াই বিভিন্ন বিষয়ে পাঠ্য-স্থচী রচনা করিতে হইবে।

আমাদের মনে রাখা উচিত যে, শিশুদের ভবিষ্যৎ জীবনে প্রয়োজনীয় সব-কিছু বিদ্যালয়ে শিখানো সম্ভব নহে। এই সত্যটি আমাদের মনে থাকে না বলিয়াই আমরা পাঠ্যস্থচীকে অযথা ভারাক্রান্ত করিয়া থাকি। শিশুদের আগ্রহ জাগানো এবং জ্ঞান অর্জন করিবার পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়াই পাঠ্য-স্থচীর লক্ষ্য হওয়া উচিত। ভবিষ্যতে কোন দিন কাজে লাগিবে বলিয়া কতকগুলি তথ্যের ভার শিশুর স্মৃতিশক্তির উপর চাপাইয়া দেওয়া উচিত নহে। শিশুরা যদি অল্প কোন জিনিস

আনন্দের সহিত ভালভাবে শেখে, তাহা হইলে ইহা তাহাদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ জাগাইবে এবং তাহাদের ভবিষ্যৎ জ্ঞানার্জনের পথও সুগম হইবে। কিন্তু যদি জীবনের সহিত সম্পর্কবিহীন বিভিন্ন বিষয়ের তথ্য শিশুদের উপর জোর করিয়া চাপানো হয়, তাহা হইলে তাহাদের শিক্ষার প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিবে।

ব্যক্তিগত পার্থক্যের প্রতি ঔদাসীন্য :

কৈশোরে বালক ও বালিকাদের নিজ নিজ রুচি, আগ্রহ ও ক্ষমতার বিকাশ হয় ; কিন্তু আমাদের পাঠ্য-সূচীতে ব্যক্তিগত পার্থক্যের প্রতি কোন লক্ষ্য করা হয় না। এক সময়ে শিক্ষাবিদ্‌দের ধারণা ছিল যে, এগার বৎসর বয়সে বালক-বালিকাদের ব্যক্তিগত পার্থক্য দেখা দেয় এবং সেইজন্যই এগার বৎসর বয়সে বিভিন্নমুখী পাঠধারার ব্যবস্থা করা হইত। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক গবেষণার দ্বারা এখন স্থির হইয়াছে যে, তের বৎসর বা তাহার কাছাকাছি সময়ে বালক-বালিকার ব্যক্তিগত পার্থক্য দেখা দেয়। ব্যক্তিগত পার্থক্যগুলিকে মোটামুটি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ইংলণ্ডে কৈশোরের বিভিন্নমুখী আগ্রহগুলিকে পুঁথিপ্রধান, কারিগরী ও বাস্তব—এই তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে এবং তদনুযায়ী Grammar, Technical ও Modern School—এই তিন প্রকার মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে। যদিও ভারতবর্ষের কোন কোন রাজ্যে শিশুদের ব্যক্তিগত পার্থক্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিভিন্ন প্রকার মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে, তথাপি সাধারণতঃ একথা বলা যাইতে পারে যে, আমাদের চল্‌তি পাঠ্য-সূচীতে শিশুদের বিভিন্ন রুচির খোরাক যোগাইবার ব্যবস্থা করা হয় নাই।

কারিগরী ও বৃত্তিমূলক পাঠের সুযোগের অভাব :

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে বহুদিনের অভিযোগ হইতেছে যে,

এখানে কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই। মাঝে মাঝে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার কিছু কিছু প্রারম্ভিক পাঠ প্রবর্তন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু এই চেষ্টা ফলবতী না হইবার কারণ এই যে, দেশে শিল্প-বিস্তার না হইলে কারিগরী শিক্ষার প্রসার হইতে পারে না। উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং সরঞ্জামের অভাবও কারিগরী শিক্ষার অন্তরায় হইয়াছে। তাহা ছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভূত সম্মান এবং পুঁথিপ্রধান শিক্ষার আকর্ষণ কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে জনপ্রিয় হইতে দেয় নাই। কিন্তু এখন অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। আমাদের শিল্প-বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে এবং অর্থনৈতিক কাঠামও সুনিশ্চিতভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর দ্রুত শিল্পোন্নতি হইয়াছে। স্বাধীনতা-লাভের পর ভারতের Planning Commission দেশে দ্রুত শিল্প-প্রসারের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। কারিগরী শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের চাহিদা অনেক বাড়িয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। শিল্প-প্রসারের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বহুমুখী শিক্ষাধারা প্রবর্তন করিবার চেষ্টা হইতেছে। কারণ যদি মাধ্যমিক শিক্ষা পুঁথিপ্রধানই থাকে এবং শিশুদের কর্মকুশলতা ও শিল্পপ্রবণতা বিকাশ করিবার চেষ্টা না করে, তাহা হইলে কারিগরী শিক্ষার জন্য উপযুক্ত ছাত্র পাওয়া যাইবে না। মাধ্যমিক শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে কলা, বিজ্ঞান, শিল্প ও বাণিজ্য প্রভৃতি জাতীয়-জীবনের বিভিন্ন দিকে দ্বিতীয় স্তরের নেতা তৈয়ারি করা। কিন্তু বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষা দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে না।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের চল্‌তি পাঠ্য-সূচী এমন হইতেছে যে, বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়া ছাত্র-ছাত্রীরা যে বাস্তব জীবনে প্রবেশ করিবে, তাহার জন্য কোন প্রস্তুতিই হয় না। বিদ্যালয় ও বাস্তব

জীবনের মধ্যে যে ফাঁক থাকিয়া যায়, তাহা পূরণ করাই মাধ্যমিক পাঠ্য-স্থচীর প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।

পাঠ্য-সূচী প্রস্তুত করিবার রীতি ঃ

পাঠ্য-স্থচী বলিতে আজকাল শ্রেণীকক্ষে যে সকল বিষয় পড়ানো হয়, শুধু তাহাই বুঝায় না। শ্রেণীকক্ষে, পাঠাগারে, গবেষণাগারে, কর্মশালায়, খেলার মাঠে এবং শিক্ষক ও ছাত্রের মিলিত বিভিন্ন কাজের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীরা যে অভিজ্ঞতা লাভ করে, এ সমস্তই পাঠ্য-স্থচীর অন্তর্গত। অর্থাৎ এক কথায়, ছাত্রদের পূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকাশ করিতে হইলে যে সমস্ত অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার প্রয়োজন, সমস্তই পাঠ্য-স্থচীতে স্থান পাওয়া উচিত।

দ্বিতীয়তঃ, পাঠ্য-স্থচী হইবে ব্যাপক ও পরিবর্তন-সাপেক্ষ যাহাতে শিশুদের ব্যক্তিগত পার্থক্যের প্রয়োজনীয়তা মিটাইতে পারে। শিশুর ইচ্ছা ও রুচির বিরুদ্ধে কিছু চাপাইয়া দিলে পাঠের প্রতি শিশুদের জাগে বিতৃষ্ণা এবং তাহাদের স্বাভাবিক বিকাশও বাধাপ্রাপ্ত হয়।

তৃতীয়তঃ, সমাজ-জীবনের সহিত পাঠ্য-স্থচীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকিবে যাহাতে শিশু সমাজ-জীবনে বিশিষ্ট ধারার সহিত পরিচিত হইতে পারে। সংঘবদ্ধ মানব-জীবনে উৎপাদনমূলক কাজের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। কাজেই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য-স্থচীতে উৎপাদন-মূলক কাজেরও স্থান নির্দেশ করা উচিত। শিক্ষা-বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত পাঠ্য-স্থচী স্থান ও কালের প্রয়োজন অনুসারে যাহাতে পরিবর্তন করা যায়, সেরূপ নির্দেশ দেওয়া উচিত।

জীবনে যেমন কাজের প্রয়োজন আছে, তেমনি আছে বিশ্রামেরও প্রয়োজন। পাঠ্য-স্থচী প্রস্তুত করিবার সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, শিশুরা ভবিষ্যৎ জীবনে সুরুচিসঙ্গত উপায়ে অবসর বিনোদন করিবার পাথেয় বিদ্যালয়ে থাকিবার সময়ই সঞ্চয় করিতে পারে।

পাঠ্য-সূচীর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়গুলি পরস্পর-সম্পর্কবিহীন পৃথক বলিয়া মনে না করিয়া সামগ্রিক জীবনের এক-একটা দিক হিসাবে গণ্য করা উচিত।

(২) মধ্য বিদ্যালয়ের পাঠ্য-সূচী

(The Curricullum at the Middle Stage)

মাধ্যমিক বিদ্যালয় দুই প্রকারের আছে—Middle School বা Senior Basic School এবং High School বা Higher Secondary School. প্রথম প্রকার বিদ্যালয়ে এগার হইতে তের বৎসরের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ার ব্যবস্থা আছে; High School-এ ছেলেমেয়েদের চৌদ্দ হইতে ষোল বৎসর এবং Higher Secondary School-এ চোদ্দ হইতে সতের বৎসরের বালক-বালিকাদের পড়াইবার ব্যবস্থা আছে।

মধ্য বিদ্যালয় বা উত্তর বুনিয়াদী বিদ্যালয় (Middle বা Junior Basic School) প্রাথমিক স্তরেরই বর্ধিত অংশ বলা যাইতে পারে। Middle School যতদিন পর্যন্ত বর্তমান থাকিবে, ততদিন Senior Basic School-এর পাঠ্য-সূচীর সহিত ইহার মোটামুটি মিল থাকিবেই। এই স্তরে বুনিয়াদী ও অ-বুনিয়াদী দুই বিভিন্ন রকমের বিদ্যালয় থাকা উচিত নয়, কারণ তাহাতে শিক্ষাক্ষেত্রে অযথা জাতিভেদ-প্রথা প্রবর্তন করা হইবে। Middle School ও Senior Basic School-এর পাঠ্য-সূচী ও শিক্ষণীয় বিষয় হইবে এক, যদিও তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য থাকিবে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, Middle ও Senior Basic School প্রাথমিক (বুনিয়াদী) বিদ্যালয়েরই বর্ধিত অংশ। অতএব এই স্তরের

পাঠ্য-স্থচী প্রস্তুত করিবার সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, এই দুই স্তরের শিক্ষণীয় বিষয় ও পদ্ধতির মধ্যে যেন আসমান-জমীন তফাত না থাকে। আজকাল সকলেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, প্রাথমিক স্তরের পাঠ্য-স্থচী হইবে কর্মকেন্দ্রিক; কাজেই মাধ্যমিক বা উত্তর বুনিয়াদী স্তরের পাঠ্য-স্থচীও যাহাতে সম্পূর্ণরূপে পুঁথিপ্রধান না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্য-স্থচীর প্রধান লক্ষ্য হইবে সাধারণভাবে জ্ঞানের বিভিন্ন দিকের সহিত শিশুদের মোটামুটি পরিচয় করাইয়া দেওয়া। অতএব ইহার মধ্যে থাকিবে ভাষা ও সাহিত্য, সামাজিক জ্ঞান, প্রকৃতি-বিজ্ঞান এবং গণিত। কিন্তু কলা, সঙ্গীত ও শিল্পকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য-স্থচীতে কোনদিনই উপযুক্ত স্থান দেওয়া হয় নাই। শিশুদের প্রক্ষোভ-জীবনের বিকাশের জন্য সঙ্গীত, কলা ও শিল্পের স্থান অনস্বীকার্য।

বলিষ্ঠ ও স্থষম ব্যক্তিত্ব গঠন করিতে হইলে ছাত্র-ছাত্রীদের শরীর গঠন করা একান্ত কর্তব্য। যেমন বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়া বুদ্ধির বিকাশ হয়, সেইরূপ বিভিন্ন কাজের মাধ্যমেই শরীর গঠিত হয়। অতএব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য-স্থচীতে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে শিশুদের যাহাতে দৈহিক উন্নতি সাধিত হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

মধ্য বিদ্যালয় বিশেষজ্ঞ তৈয়ারি করিবার স্থান নহে। জ্ঞানের বিভিন্ন ধারার সহিত একটা মোটামুটিভাবে শিশুদের পরিচয় করাইয়া দেওয়াই উদ্দেশ্য। এই বয়সেই শিশুদের বিশেষ বিশেষ দিকে যোগ্যতা বা রুচির লক্ষণ দেখা যায়। কাজেই এই স্তরের পাঠ্য-স্থচী ও পরিবেশ এমন হইবে যাহাতে শিশু নিজের রুচি ও বিশেষ ক্ষমতা কোন্ দিকে আছে, তাহা আবিষ্কার করিতে পারে। এই স্তরের পাঠ্য-স্থচীকে তথ্যের ভারে ভারাক্রান্ত না করিয়া শিশুরা যাহাতে সভ্যতা-বিকাশের

জন্য মানুষ কি করিয়াছে তাহার একটা ধারণা করিতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য-সূচীতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির স্থান পাওয়া উচিত :—

(১) ভাষা, (২) সামাজিক জ্ঞান, (৩) সাধারণ বিজ্ঞান, (৪) গণিত, (৫) সঙ্গীত ও কলা, (৬) কারু-শিল্প ও (৭) শারীরিক জ্ঞান।

ভাষার মধ্যে প্রথমে আসিবে মাতৃভাষা অথবা আঞ্চলিক ভাষা। তাহার পর রাষ্ট্রের ভাষা অর্থাৎ হিন্দী। যদি হিন্দী মাতৃভাষা হয়, তাহা হইলে ছাত্র-ছাত্রীরা অন্য যে-কোন একটি ভাষা শিখিতে পারে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে রাষ্ট্রভাষা হিন্দী এবং আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে ইংরাজী শিখাইবার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। যদি ছাত্র বা তাহার অভিভাবকরা ইংরাজী শিক্ষার পক্ষপাতী না হন, তাহা হইলে ইংরাজীকে ঐচ্ছিক ভাষা হিসাবে রাখিতে হইবে। যে সকল বিদ্যালয়ে ইংরাজীকে ঐচ্ছিক ভাষা হিসাবে রাখা হইবে সেখানে যে সকল ছাত্র-ছাত্রী ইংরাজী ভাষা ঐচ্ছিক হিসাবে পড়িবে না, তাহাদের জন্য অতিরিক্ত মাতৃভাষা পড়াইবার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

মাতৃভাষা ছাড়া আরও দুইটি ভাষা পাঠ্য-সূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হইলে ছাত্র-ছাত্রীদের উপর চাপ খুব বেশী পড়িবে। কিন্তু ভারতবর্ষের মত দেশে যেখানে বহু ভাষা প্রচলিত আছে, সেখানে ইহা ছাড়া উপায়ও নাই। সেইজন্য Mudaliar Commission নির্দেশ দিয়াছেন যে, কোন বৎসরে একটির বেশী নূতন ভাষা আরম্ভ করা হইবে না। মাতৃভাষা ছাড়া আর যে দুইটি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইবে, তাহার শুধু ব্যবহারিক দিকটার উপরই নজর দেওয়া হইবে, সাহিত্যিক খুঁটিনাটির বিষয়ে লক্ষ্য করা হইবে না।

কারু-শিল্প সম্বন্ধে Mudaliar Commission সুপারিশ করিয়াছেন

যে, স্থানীয় শিল্পের উপর জোর দিতে হইবে এবং স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহার করিতে হইবে। কারণ ইহার সহিত শিশুদের পরিচয় আছে বলিয়া শিক্ষাদান সহজ হইবে।

High School ও Higher Secondary School-এর পাঠ্য-সূচী ঃ

মধ্য বিদ্যালয় স্তরের শেষে ছাত্রদের বিশেষ ক্ষমতা ও আগ্রহ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কাজেই High School বা Higher Secondary School-এর curriculum ছাত্রদের আগ্রহ ও ক্ষমতাকে ভিত্তি করিয়া গঠন করিতে হইবে। High School বা Higher Secondary School-এ বিভিন্ন প্রকার শিক্ষাধারার ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে শিশুরা ইচ্ছামতো বিষয় নির্বাচন করিতে পারে। ইহার অর্থ এই নহে যে, এই বয়সে ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষজ্ঞ করিবার চেষ্টা করা হইবে ;—যাহাতে ছাত্রদের অন্তর্নিহিত বিশেষ-ক্ষমতার অভিব্যক্তি হয় সেই দিকে লক্ষ্য করিতে হইবে।

High School-এর পাঠ্য-সূচী প্রস্তুত করিবার পূর্বে আর একটি কথাও ভাবিবার আছে। অনেক ছেলেমেয়ের শিক্ষা এই স্তরেই শেষ হইবে। সাধারণতঃ যে সকল ছাত্র-ছাত্রী High School বা Higher Secondary School হইতে পাস করিয়া বাহির হইবে, তাহাদের শতকরা ২৫।৩০ জনের বেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে বা কোন উচ্চ কারিগরী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করার সম্ভাবনা কম। বেশীর ভাগ ছেলেকেই High School-এর শিক্ষার পর জীবিকা অর্জনের কথা চিন্তা করিতে হয়। কাজেই High School বা Higher Secondary School-এর কার্যসূচী এমনভাবে করিতে হইবে যাহাতে ছাত্রদের কোন একটা উপজীবিকা অবলম্বন করিবার মত শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতি জন্মে। এই স্তরের শিক্ষা বৃত্তিমূলক হইবে না বটে, কিন্তু ইহাতে বৃত্তির আভাস থাকিবে। যে ছেলে যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে আগ্রহ দেখায়, সে কারিগরী

বিদ্যার আভাসযুক্ত (technical bias) শিক্ষাধারা গ্রহণ করিলেই Engineering শিক্ষা করিবে না, তবে ভবিষ্যতে Engineering শিক্ষার যে শাখায় যাইবে তাহার একটা প্রারম্ভিক ধারণা লাভ করিবে। কোন ছেলে যদি কৃষি-শিক্ষা গ্রহণ করে, তাহা হইলে যে তাহাকে কৃষিকার্য করিতেই হইবে তাহা নহে, সমাজ-জীবনের একটা দিকের প্রতি তাহার আগ্রহ আছে বলিয়া সে সম্বন্ধে সে জ্ঞান লাভ করিয়াছে। তাঁহাকেই আমরা ভাল শিক্ষক বলিব যিনি কৃষি, বিজ্ঞান, কারিগরী বিদ্যা প্রভৃতিকে সাধারণ শিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণ করিতে পারিবেন। এই দৃষ্টিভঙ্গিই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহিত কারিগরী শিক্ষার পার্থক্য নির্দেশ করে।

High School বা Higher Secondary School-এর পাঠ্য-সূচী প্রস্তুত করিবার সময় আর একটা কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে। High School বা Higher Secondary School-এ ছাত্রেরা আসে হয় Middle School কিংবা Senior Basic School হইতে। যতদিন পর্যন্ত এই দুই প্রকার বিদ্যালয়ে বিভিন্ন পাঠ্য-সূচী এবং বিভিন্ন শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসরণ করা হইবে ততদিন High School-এ একটি প্রারম্ভিক শ্রেণী রাখিতে হইবে, যেখানে ছাত্রেরা একই প্রকার অভিজ্ঞতা লাভ করিবে এবং একই দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া একই কার্যসূচী অনুসরণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইবে। Mudaliar Commission সুপারিশ করিয়াছেন যে, High School-এর প্রথম শ্রেণীতে যতদূর সম্ভব পূর্ব স্তরের পাঠ্য-সূচীই অনুসরণ করা হইবে এবং দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে পৃথক নূতন পাঠ্যক্রম প্রবর্তন করা হইবে।

High School এবং Higher Secondary School-এর course একই ধাঁচের হইবে। কতকগুলি আবশ্যিক বিষয় সকলকেই পড়িতে হইবে, আর কতকগুলি থাকিবে ঐচ্ছিক বিষয়। High School-এর course তিন বৎসরের এবং Higher Secondary

School-এর course চারি বৎসরের ; কাজেই High School-এর পাঠ্য-সূচী অপেক্ষাকৃত লঘু হইবে, তথাপি একই বিষয়ের পাঠ্য-সূচীর মধ্যে যতটা সম্ভব সামঞ্জস্য থাকা বাঞ্ছনীয়।

High School এবং Higher Secondary School-এর একটা খস্‌ড়া পাঠ্য-সূচী পরপৃষ্ঠায় দেওয়া হইল। এই পাঠ্য-সূচী হইতেছে নির্দেশাত্মক; যে-কোন বিদ্যালয় প্রয়োজন অনুসারে ইহার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিতে পারে।

পাঠ্য-সূচী ঃ

A. (*i*) মাতৃভাষা অথবা আঞ্চলিক ভাষা অথবা মাতৃভাষা এবং সংস্কৃত, আরবী, পারসীক প্রভৃতি একটি প্রাচীন ভাষার মিশ্রণ।

(*ii*) নিম্নলিখিত তালিকার অন্তর্গত যে-কোন একটি ভাষা লইতে হইবে ঃ—

(*a*) হিন্দী (হিন্দী যাহাদের মাতৃভাষা নহে তাহাদের জন্য)।

(*b*) প্রাথমিক ইংরাজী (যাহারা মাধ্যমিক স্তরে ইংরাজী পড়ে নাই তাহাদের জন্য)।

(*c*) উন্নত ইংরাজী (Advanced English)—(যাহারা প্রাথমিক মাধ্যমিক স্তরে ইংরাজী পড়ে নাই তাহাদের জন্য)।

(*d*) একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা (হিন্দী ছাড়া)।

(*e*) একটি আধুনিক বিদেশী ভাষা (ইংরাজী ছাড়া)।

(*f*) সংস্কৃত প্রভৃতি একটি প্রাচীন ভাষা।

B. (*i*) সামাজিক জ্ঞান—সাধারণভাবে (প্রথম দুই বৎসরের জন্য)।

(*ii*) গণিত সমেত সাধারণ বিজ্ঞান—সাধারণ শিক্ষাধারা—(প্রথম দুই বৎসরের জন্য)।

C. নিম্নলিখিত তালিকার মধ্য হইতে যে-কোন একটি কারু-শিল্প

বাছিয়া লইতে হইবে (স্থানীয় প্রয়োজন অনুসারে তালিকা বাড়ানো যাইতে পারে) ঃ—

(*a*) কাতাই ও বুনাই ;

(*b*) কাঠের কাজ ;

(*c*) কাঁসা, পিতল প্রভৃতি ধাতুর কাজ ;

(*d*) বাগানের কাজ ;

(*e*) সেলাই-এর কাজ ;

(*f*) টাইপ করা ;

(*g*) কর্মশালার (Workshop) কাজ ;

(*h*) সূচী-শিল্প ও Embroidery ;

(*i*) প্রতিকৃতি-প্রস্তুত।

D. নিম্নলিখিত তালিকা হইতে যে-কোন তিনটি লইতে হইবে ঃ—

GROUP 1. **Humanities**

(*a*) একটি প্রাচীন ভাষা যাহা লওয়া হয় নাই ;

(*b*) ইতিহাস ;

(*c*) ভূগোল ;

(*d*) প্রারম্ভিক অর্থশাস্ত্র (Elements of Economics) ;

(*e*) তর্কশাস্ত্র ও মনোবিজ্ঞানের কিছু কিছু অংশ ;

(*f*) গণিত ;

(*g*) সঙ্গীত ;

(*h*) গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান।

GROUP 2. **Science (বিজ্ঞান)**

(*a*) পদার্থ-বিজ্ঞান (Physics) ;

(*b*) রসায়ন শাস্ত্র (Chemistry) ;

(*c*) প্রাণি-বিজ্ঞান (Biology) ;

(*d*) ভূগোল (Geography) ;

(*e*) শারীর-বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যতত্ত্বের কিছু কিছু অংশ (প্রাণি-বিজ্ঞানের সহিত ইহা লওয়া চলিবে না)।

GROUP 3. **Technical (কারিগরী)**

(*a*) ফলিত গণিত এবং জ্যামিতিক অঙ্কন ;

(*b*) ফলিত বিজ্ঞান ;

(*c*) Mechanical Engineering-এর কিছু কিছু অংশ ;

(*d*) Electrical Engineering-এর কিছু কিছু অংশ।

GROUP 4. **Commercial (বাণিজ্য-সংক্রান্ত)**

(*a*) ব্যবসায়-সংক্রান্ত পদ্ধতি ;

(*b*) হিসাব-রক্ষা (Book-keeping) ;

(*c*) আর্থিক ভূগোল অথবা অর্থশাস্ত্র ও পৌর বিজ্ঞানের কিছু কিছু অংশ ;

(*d*) Shorthand and Type-Writing.

GROUP 5. **Agriculture (কৃষি)**

(*a*) সাধারণ কৃষি-বিজ্ঞান (General Agriculture) ;

(*b*) পশুপালন (Animal Husbandry)

(*c*) ফল ও ফুলের বাগান-রচনা (Horticulture and gardening) ;

(*d*) কৃষি-বিষয়ক রসায়ন ও উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান।

GROUP 6. **Fine Arts (চারু শিল্প)**

(*a*) ললিতকলার ইতিহাস (History of Art) ;

(*b*) চিত্র ও নক্সা অঙ্কন (Drawing & Designing) ;

(*c*) ছবি অঙ্কন (Painting) ;

(*d*) প্রতিকৃতি প্রস্তুত করা (Modelling) ;

(e) সঙ্গীত;

(f) নৃত্য।

GROUP 7. Home Science (গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান)

(a) গার্হস্থ্য অর্থ-বিজ্ঞান (Home Economics);

(b) রন্ধন ও পুষ্টিসাধন (Nutrition and cookery);

(c) শিশু-পালন ও শিশুর যত্ন (Mothercraft & Childcare);

(d) গৃহ-পরিচালনা ও গার্হস্থ্য পরিচর্যা (Household Management and Home-Nursing)।

E. ইহা ছাড়া ছাত্রেরা যে-কোন বিভাগ হইতে একটি বিষয় ঐচ্ছিকভাবে গ্রহণ করিতে পারিবে।

উত্তরে বলা হইয়াছে যে, ছাত্রদের মাতৃভাষা ছাড়া আর একটি ভাষা শিখিতে হইবে। ইহা হিন্দী, ইংরাজী বা তাহার প্রয়োজন ও রুচি অনুযায়ী যে-কোন ভাষা হইতে পারে। বেশীর ভাগ ছেলেমেয়ে একান্ত প্রয়োজনীয় ভাষাগুলিই শিখিবে; কিন্তু ভাষা শিখিবার বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন ছেলেমেয়েরা ইচ্ছা করিলে অতিরিক্ত একটি ভাষাও শিক্ষা করিতে পারে।

সামাজিক জ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, ভাষা ও একটি কারু-শিল্প —ইহাই প্রকৃতপক্ষে হইবে High School-এর অবশ্য-পাঠ্য বিষয়। ইহা ছাড়া, ছাত্রেরা তাহাদের রুচি ও যোগ্যতা অনুযায়ী ঐচ্ছিক বিষয় গ্রহণ করিতে পারিবে।

যে ছাত্র-ছাত্রী ইতিহাস, ভূগোল অথবা অর্থশাস্ত্র ও পৌর বিজ্ঞান (Humanities group) পড়িবে, তাঁয় যখন বহুমুখী শিক্ষা প্রবর্তিত হইবে তখন তাহাকে সামাজিক বিজ্ঞান না পড়িয়া সাধারণ বিজ্ঞান পড়িতে হইবে। সেই রকম যে ছাত্র-ছাত্রী বিজ্ঞান, কারিগরী শিক্ষা বা কৃষি-বিভাগের অন্তর্গত বিজ্ঞান পড়িবে, তাহাকে সাধারণ

বিজ্ঞান না পড়িয়া সামাজিক বিজ্ঞান পড়িতে হইবে। যে সকল ছাত্র বাণিজ্য-বিভাগে পড়িবে তাহাদিগকে আর্থিক ভূগোলের অংশ হিসাবে সামাজিক বিজ্ঞানের কিছু কিছু পড়িতে হয়। সেইজন্য তাহাদের সামাজিক বিজ্ঞানের পরিবর্তে সাধারণ বিজ্ঞান লইতে হইবে। যাহারা Fine Arts group-এ পড়িয়াছে তাহাদের ললিতকলার ইতিহাস পাঠ করিবার সময় সামাজিক শিক্ষার সহিত কিছুটা পরিচয় হইয়াছে; সেইজন্য তাহাদিগকে সামাজিক বিজ্ঞানের পরিবর্তে সাধারণ বিজ্ঞান পড়িতে হইবে। যাহারা গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান লইয়াছে তাহাদের প্রথম দুই বৎসর সামাজিক বিজ্ঞান ও সাধারণ বিজ্ঞান দুই-ই পড়িতে হইবে।

Mudaliar Commission সুপারিশ করিয়াছেন যে, প্রত্যেক High School-এ একটা করিয়া craft বা কারু-শিল্প থাকিবে। এই বয়সে প্রত্যেক ছেলের দৈনিক কিছু সময় হাতের কাজ করা উচিত এবং এই কাজে তাহার এরূপ দক্ষতা লাভ করা উচিত যে, প্রয়োজন হইলে ইহা দ্বারা সে যেন নিজের জীবিকা অর্জন করিতে পারে। অর্থনৈতিক দিক হইতেই বিচার করিয়া বিদ্যালয়ে কারু-শিল্প প্রবর্তন করিবার কথা বলা হইয়াছে, তাহা নহে। কৈশোর বয়সে হাতের কাজ করিলে বালক-বালিকারা শ্রমের মর্যাদা বুঝিতে পারিবে এবং গঠনমূলক কাজ করিতে শিখিবে। নিজের হাতে সুন্দর ও প্রয়োজনীয় জিনিস করার চেয়ে আর কোন বড় শিক্ষার মাধ্যম হইতে পারে না।

High School-এ শিশু যে কারু-শিল্প গ্রহণ করিবে, তাহা সে Middle School-এ যে craft গ্রহণ করিয়াছিল তাহাই হইতে পারে বা নূতন কোন craft-ও হইতে পারে। Middle School-এ শিশু শিল্পকার্যে কিছুটা দক্ষতা অর্জন করে। High School-এ আরও বেশী কর্মকুশলতা লাভ করিতে পারে। এই স্তরে শিল্পের সৌন্দর্যের দিকটার

উপর বেশী লক্ষ্য পড়িবে। তাহা ছাড়া, শিল্পকার্যের অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক দিকটার উপর এখন জোর দিতে হইবে। শিশু ইচ্ছা করিলে High School-এ নূতন একটি শিল্পও গ্রহণ করিতে পারে।

কারু-শিল্প শিক্ষা দিতে হইলে দুইটি কথা মনে রাখিতে হইবে। কোন শিল্প সম্বন্ধে ভালভাবে শিক্ষা দিতে হইলে সেই শিল্পে বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন একজন লোকের দরকার।

শিল্পকে শিক্ষার বাহন করিতে হইলে শিল্পকার্যে অভিজ্ঞ একজন শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকের দরকার। কিন্তু বর্তমানে শিল্পে অভিজ্ঞ শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব। অতএব এখন শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষক একজন শিল্পে দক্ষ ব্যক্তির সহযোগে ছাত্রদের শিল্প শিক্ষা দিতে পারেন।

বিভিন্নমুখী পাঠ্যক্রম আরম্ভ হইবে High বা Higher Secondary School-এর দ্বিতীয় বৎসর হইতে, কিন্তু কারু-শিল্প শিখানো শুরু হইবে প্রথম বৎসর হইতে। প্রথম বৎসরে আরও একটা বিষয় প্রবর্তন করিলে সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয়। এখানে আর একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, ভাষা ছাড়া আর কোন বিষয় সমগ্র High বা Higher Secondary স্তরে পড়ার প্রয়োজন নাই। বিষয়ের গুরুত্ব হিসাবে কোনটি দুই বা তিন বৎসরে শেষ করা যাইতে পারে। Shorthand ও Type-Writing চারি বৎসর ধরিয়া পড়াইবার প্রয়োজন নাই। প্রথম বৎসরে Type-Writing এবং শেষের দুই বৎসরে Shorthand শেখার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

ভাষা ঃ

ভাষার মধ্যে মাতৃভাষার স্থান সর্বোচ্চে। কিন্তু এই সত্যটি আমরা এতদিন উপলব্ধি করিতে পারি নাই। যে-কোন যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকই মাতৃভাষা পড়াইতে পারিবেন আমাদের এই বিশ্বাস হইয়াছিল এবং অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষক অপেক্ষা ভাষা-শিক্ষকের বেতন ছিল কম।

লিখিতে পড়িতে শিখিলে এবং শব্দ-ভাণ্ডার বৃদ্ধি হইলেই মাতৃভাষা শিক্ষা হইয়াছে বলা চলে না। মাতৃভাষা হইতেছে শিশুর ব্যক্তিত্ব-বিকাশের মাধ্যম। ভাল শিক্ষক মাতৃভাষার মাধ্যমে শিশুকে স্পষ্টভাবে চিন্তা করিতে এবং পরিষ্কাররূপে ভাব প্রকাশ করিতে শিক্ষা দিতে পারেন। মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিশুর অনুভূতি ও বোধশক্তি বিকাশ হয়, রুচি হয় উন্নত। সাহিত্যের ভাল ভাল পুস্তক পাঠ করিয়া এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিদের চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হইয়া শিশুদের চরিত্র গঠন হয় এবং জিনিসের প্রকৃত মূল্য দিতে শিখে। লেখা, পড়া, বক্তৃতায় নিজের প্রকাশ-ক্ষমতা, সাহিত্যকে জীবনের প্রতিবিম্বরূপে উপলব্ধি করিবার স্পৃহা, পাঠ্য-পুস্তক ছাড়া অন্যান্য পুস্তক পড়িবার আগ্রহ জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করা মাতৃভাষা শিখাইবার লক্ষ্য হওয়া উচিত। যদি শিক্ষাপ্রাপ্ত যোগ্য শিক্ষকের উপর মাতৃভাষা শিখাইবার ভার অর্পিত হয়, তাহা হইলে শিক্ষার মান বাড়িয়া যাইবে।

কিন্তু মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষা শিখাইবার সময় আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হইবে বাস্তব। ছাত্র-ছাত্রীরা যাহাতে ভাল করিয়া পড়িতে পারে এবং স্পষ্ট করিয়া মনের ভাব লেখা ও কথার মাধ্যমে প্রকাশ করিতে পারে, শিক্ষকের সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

সামাজিক বিজ্ঞান ঃ

সামাজিক বিজ্ঞান বলিতে আমরা ইতিহাস, ভূগোল, অর্থশাস্ত্র, পৌর শাসন ইত্যাদি কতকগুলি বিষয়কে একত্র করিয়া বুঝি। এই বিষয়গুলি পৃথক পৃথক না পড়াইয়া পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া পড়াইতে হইবে, যাহাতে ইহা দ্বারা ছাত্রেরা নিজেদেরকে পরিবেশের সহিত মানাইয়া লইতে পারে। ইহা দ্বারা ছাত্রদের সমাজে দলবদ্ধভাবে বাস করিবার এবং সমাজের কল্যাণ-সাধন করিবার মনোভাব জাগ্রত হইবে।

সাধারণ বিজ্ঞান ঃ

বর্তমান জগতে বাস করিতে হইলে বিজ্ঞানের মূল নীতিগুলির মোটামুটি একটি ধারণা থাকা প্রয়োজন। মধ্য বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বিজ্ঞানের সাধারণ জ্ঞান দিতে হইবে যাহাতে তাহারা বাস্তব জীবনে বিজ্ঞানের প্রভাব সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারে। কিন্তু High School স্তরে পদার্থ-বিজ্ঞান (Physics), রসায়ন শাস্ত্র (Chemistry) ও প্রাণি-বিজ্ঞান (Biology) পৃথকভাবে পড়াইতে হইবে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি করিবার জন্য বিজ্ঞান পড়ানো হয় না। যাহাতে শিশুরা ভবিষ্যতে পূর্ণতর জীবন যাপন করিতে পারে, সেইজন্য বৈজ্ঞানিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা জন্মাইয়া দিবার উদ্দেশ্যেই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান পড়াইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মুষ্টিমেয় যে কয়টি ছেলেমেয়ে ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিক হইতে পারে, তাহাদিগকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়েই বিজ্ঞানের মূলনীতিগুলির সহিত পরিচয় করাইয়া দিতে হইবে। প্রতিপাদন, গবেষণাগার, কর্মশালা প্রভৃতি পরিদর্শন এবং বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার উপর বেশী জোর দিতে হইবে যাহাতে বিদ্যালয়ে পঠিত তথ্যের সহিত বাস্তব জীবনের যোগসূত্র স্থাপিত হইতে পারে। এই স্তরে বিজ্ঞান-শিক্ষকের লক্ষ্য হইবে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করিবার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করা।

নবম অধ্যায়

পরীক্ষা (Examination)

বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রধান দোষ হইতেছে এই যে, পরীক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় খুব বেশী। এ পর্যন্ত যতগুলি কমিটি ও কমিশন নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থার উপর পরীক্ষার অবাঞ্ছনীয় প্রভাব দেখিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন। যদিও সকল শিক্ষাবিদ্ই পরীক্ষার সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন, তবু পরীক্ষা-পদ্ধতির সংস্কারের জন্য বিশেষ কিছু করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতি-সাধন করিতে হইলে সর্বাগ্রে পরীক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার করিতে হইবে। এখন দেখা যাউক্, কোন্ কোন্ কমিটি ইহার সম্বন্ধে কি সুপারিশ করিয়াছেন।

Sadlar Commission বলিয়াছেন: বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিকেই বাংলা দেশে সকল রকম চাকুরির ছাড়পত্র বলা যাইতে পারে; অতএব বাংলা দেশের শিক্ষার সংস্কার করিতে হইলে পরীক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কার করা একান্ত প্রয়োজন। প্রচলিত পরীক্ষা-ব্যবস্থার অপ্রয়োজনীয় খুঁটিনাটির দিকে লক্ষ্য দেওয়ার জন্য ছাত্রদের জীবনে প্রস্তুতি ব্যাহত হয়। সকল পরীক্ষার্থীদের সমান চক্ষে দেখিবার অজুহাতে যন্ত্রবৎ পরীক্ষার খাতায় নম্বর দেওয়ার পদ্ধতি ছাত্রদের মুখস্থ করিতে উৎসাহিত করে, ইহাতে তাহাদের বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। Sadlar Commission বলেন যে, বিভিন্ন পরীক্ষার লক্ষ্য প্রথমে পরিষ্কারভাবে নির্ধারণ করিতে হইবে এবং এই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া পরীক্ষার পরিকল্পনা করিতে এবং চালাইতে হইবে। পরীক্ষা পরিচালনা করিবার জন্য Sadlar Commission নিম্নোক্ত সুপারিশ করিয়াছেন :—

১। Special Examination Board স্থাপন: এই Board মাঝে মাঝে পরীক্ষা-পদ্ধতি সমালোচনা করিবে। 'Pass', 'Distinction', 'First Division' এবং 'Second Division'-এর জন্য কি রকম উত্তর বাঞ্ছনীয়, তাহা দেখাইবার জন্য Board-এর উচিত মাঝে মাঝে আদর্শ উত্তরের নমুনা প্রকাশ করা। এই Board-এর পরীক্ষা-পদ্ধতি পরিদর্শন করা এবং সে সম্বন্ধে পরামর্শ দিবার ক্ষমতা থাকিবে, কিন্তু কার্যকরী ক্ষমতা থাকিবে না। বিভিন্ন পরীক্ষকের নম্বর দেওয়ার পদ্ধতির মধ্যে কতটা পার্থক্য হয়, তাহা Board পরীক্ষা করিয়া দেখিবে।

২। **পরীক্ষকদের নাম গোপন রাখা এবং পরীক্ষক ও পরীক্ষার্থীদের যোগাযোগ বন্ধ করা।**

৩। **পরীক্ষার্থীদের নামের পরিবর্তে রোল নম্বর ব্যবহার করা।**

৪। **শ্রেণীর নিয়মিত কাজের উপরও কিছু নম্বর দেওয়া।**

৫। **Viva voce Examination**: লিখিত পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে *viva voce* পরীক্ষার ব্যবস্থাও করিতে হইবে।

৬। বৈজ্ঞানিক বিষয়ের আবশ্যিক Practical পরীক্ষা।

৭। **বিকল্প প্রশ্ন (Alternative questions)।**

৮। **Grace marks**: সকল শেষ পরীক্ষায় (Final Examination) grace mark দেওয়া বন্ধ করা উচিত।

৯। পরীক্ষকের দেওয়া নম্বর ঠিক আছে কিনা, পরীক্ষা করিয়া দেখা (checking of marks)।

১০। পুনরায় পরীক্ষা (Re-examination): যদি কোন পরীক্ষার্থী সব বিষয়ে পাস করিয়া এক বিষয়ে ফেল করে, তাহা হইলে তাহার খাতা পুনরায় পরীক্ষা করিবার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

১১। পরীক্ষা গ্রহণ ও পরীক্ষার ফল বাহির করা ঃ পরীক্ষার পর যত শীঘ্র সম্ভব ফল বাহির করা উচিত।

১২। যে ছাত্রেরা পরীক্ষায় ফেল করে তাহাদের পুনরায় বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার সুযোগ।

১৩। একটি ছাত্র একই পরীক্ষা কয়বার দিতে পারিবে, তাহা নির্দেশ করা। বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ে স্থান থাকিলে পরীক্ষায় ফেল করিয়াছে বলিয়া কোন পরীক্ষার্থীকে ভর্তি করিতে আপত্তি করা উচিত নহে।

Sadlar Commission আরও সুপারিশ করিয়াছেন যে, বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন কতকগুলি বিষয় থাকিবে যাহা ছাত্রদের পড়িতে হইবে কিন্তু পরীক্ষা দিতে হইবে না।

Radhakrishnan Commission বলিয়াছেন ঃ ভারতবর্ষ এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের শিক্ষাবিদ্‌রা পরীক্ষার কুফল সম্বন্ধে এত সচেতন যে, কেহ কেহ পরীক্ষা একেবারে উঠাইয়া দেওয়ার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু Radhakrishnan Commissson মনে করেন যে, পরীক্ষা একেবারে বাদ দেওয়া যায় না, তবে ইহার সংস্কার প্রয়োজন। পরীক্ষা হইবে বাস্তব (objective); পরীক্ষকের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের স্থান যাহাতে খুব বেশী না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। শিক্ষার উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া পরীক্ষা-ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বর্তমান পরীক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতি-বিধান করিবার জন্য Radhakrishnan Commission নিম্নলিখিত সুপারিশ করিয়াছেন :—

১। কলেজীয় শিক্ষার জন্য ছাত্র নির্বাচন করিবার ও পরামর্শ দিবার জন্য বিভিন্ন প্রকার বাস্তব (objective) পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

২। শিক্ষককে সাহায্য করিবার এবং তাঁহার কাজের যাচাই করিবার জন্য বাস্তব পরীক্ষার (objective test) ব্যবস্থা করা।

৩। Objective test-এর প্রবর্তন করার জন্য Essay-type প্রশ্ন একেবারে বাদ দেওয়া সম্ভব নহে। Essay-type প্রশ্নের দোষ-ত্রুটিগুলি যাহাতে দূর হইতে পারে, সেদিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

৪। Radhakrishnan Commission আরও বলিয়াছেন, শিক্ষা-বিভাগের উচিত পরীক্ষার জন্য বিজ্ঞানসম্মত test ও তাহার প্রয়োগ সম্বন্ধে গবেষণার ব্যবস্থা করা।

৫। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি Board of Examiners নিয়োগ করিতে হইবে।

৬। Higher Secondary School-এর শেষে পরীক্ষার জন্য কতকগুলি psychological ও achivement test প্রস্তুত করিতে হইবে।

৭। শ্রেণীতে ছাত্রদের পড়াশুনার কেমন উন্নতি হইতেছে, তাহা যাচাই করিবার জন্য কতকগুলি psychological test প্রস্তুত করিতে হইবে।

বর্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতিতে যে দোষ-ত্রুটি আছে তাহা দূর করিবার উদ্দেশ্যে Radhakrishnan Commission নিম্নলিখিত স্থপারিশ করিয়াছেন :—

১। সরকারী শাসন-সংক্রান্ত চাকুরির (Administrative Service) জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি চাওয়া উচিত নহে। বিভিন্ন প্রকার সরকারী চাকুরির জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত এবং যে-কোন যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীই এই পরীক্ষা দিতে পারিবে।

২। প্রত্যেক বিষয়ে যত নম্বর থাকে তাহার অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ শ্রেণীর কাজের জন্য আলাদা করিয়া রাখা উচিত।

৩। পরীক্ষক নিযুক্ত করিবার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। যিনি কোন বিষয়ে অন্ততঃপক্ষে পাঁচ বৎসর অধ্যাপনা

করেন নাই, তাঁহাকে পরীক্ষক নিয়োগ করা উচিত নহে। একাদিক্রমে তিন বৎসরের বেশী একই ব্যক্তিকে পরীক্ষক নিযুক্ত করা উচিত নহে। অবশ্য তিন বৎসর বাদ দিয়া পুনরায় তাঁহাকে পরীক্ষক নিযুক্ত করা যাইতে পারে।

৪। পরীক্ষা-গ্রহণকারী প্রত্যেক পর্যতের উচিত অন্যান্য দেশে Essay-type পরীক্ষার দোষ কমাইবার জন্য কি করিতেছে, তাহা অনুসন্ধান করা এবং পরীক্ষকের খেয়াল-খুশির সুযোগ কমাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করা।

৫। পরীক্ষায় পাসের মান উন্নত করিতে হইবে। First Class বা Division, Second Class ও Third Class পাইতে হইলে যথাক্রমে (শতকরা) ৭০%, ৫৫% হইতে ৬৯% এবং অন্ততঃ ৪০% নম্বর পাইতে হইবে।

৬। পরীক্ষায় grace marks দেওয়া বন্ধ করা উচিত। Mudaliar Commission পরীক্ষা সম্বন্ধে কি মন্তব্য করিয়াছেন, দেখা যাউক।

অভিভাবক এবং শিক্ষকদের জানা দরকার, ছেলেমেয়েরা কেমন পড়াশুনা করিতেছে এবং সমাজও জানিতে চায় যে, স্কুলের উপর যে কাজ দেওয়া হইয়াছে সে কাজ ভালভাবে হইতেছে কি না এবং বিদ্যালয়ে যে সব ছেলেমেয়েকে পাঠানো হইয়াছে তাহারা ঠিকমত শিক্ষা পাইতেছে কি না। পরীক্ষা দ্বারাই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।

পরীক্ষা দুই প্রকার: ভিতরের ও বাহিরের (internal ও external)। স্কুলেই অন্ততঃ বৎসরে একবার করিয়া পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় ছাত্রদের পড়াশুনা কেমন হইতেছে, তাহা দেখিবার জন্য এবং উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত (promotion) করিবার জন্য।

বাৎসরিক পরীক্ষা সকল স্কুলেই হইয়া থাকে। কোন কোন স্কুলে

প্রতি term-এর শেষে আন্তঃ-পরীক্ষা (terminal examination) হয়। আবার কোন কোন স্কুলে সাপ্তাহিক পরীক্ষার ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু বাৎসরিক পরীক্ষাই ছাত্র এবং অভিভাবকদের নিকট সবচেয়ে মূল্যবান্ বলিয়া মনে হয়। কারণ ইহার উপরই নির্ভর করে ছাত্রদের শ্রেণীতে উঠা। কয়েকটি স্কুলে বাৎসরিক পরীক্ষা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে—আন্তঃ-পরীক্ষায় ছাত্রদের কৃতিত্বের উপরই নির্ভর করে উপরের শ্রেণীতে উঠা।

বিদ্যালয়ে পাঠের শেষে হয় বাহিরের পরীক্ষা (external examination)। ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে, ছাত্রেরা পরবর্তী স্তরের শিক্ষার উপযুক্ত কি না তাহা যাচাই করিয়া লওয়া। প্রবেশিকা পরীক্ষা ছাড়াও অনেক রাজ্যে আরও দুইটি সাধারণ পরীক্ষার (public examination) ব্যবস্থা আছে। একটি প্রাথমিক স্তরের শেষে এবং আর একটি মধ্য স্তরের শেষে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা পরীক্ষা-ভারাক্রান্ত।

ভিতরের ও বাহিরের পরীক্ষা (internal and external examinations)—দুই-ই এক ধরনের হয়। দুই প্রকার পরীক্ষারই লক্ষ্য হইতেছে, ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনার কিরূপ উন্নতি হইয়াছে তাহা দেখা। শিশুর বুদ্ধিবৃত্তি ছাড়া অন্য দিকের কোন বিকাশ হয় না বলিলেই চলে। শিক্ষার উদ্দেশ্য হইতেছে, শিশুর ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন করা। পরীক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ কতটা হইয়াছে তাহা দেখা।

বর্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতিতে শিশুর বুদ্ধির বিকাশ কতটা হইয়াছে, তাহাও যাচাই করা হয় কি না সন্দেহ।

কোন্ বিষয়ে কি এবং কতটা পড়ানো হইবে শুধু তাহাই পরীক্ষার প্রয়োজনের তাগিদে স্থির হয় না, কোন্ পদ্ধতিতে পড়ানো হইবে

তাহাও স্থির হয়। যদি কোন বিষয়ে পরীক্ষা লওয়া না হয়, তাহা হইলে ছাত্রদের ইহার প্রতি কোনরূপ আগ্রহ দেখা যায় না। পড়াইবার পদ্ধতি হিসাবে সেই পদ্ধতিই ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহান্বিত করে যাহা সহজে পাস করিতে সাহায্য করে।

বর্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতি কেবল ছাত্রের নহে, শিক্ষকের উপরও প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। চরিত্র-গঠন, পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্ব-বিকাশ, পরিবেশের সঙ্গে মানাইয়া লইবার ক্ষমতা, জীবনে সুন্দর জিনিস উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়ে দ্রুত ফল দেখানো শিক্ষকের পক্ষে কঠিন ; কিন্তু বুদ্ধিগত ও পড়াশুনার বিষয়ে সুফল দেখানো অপেক্ষাকৃত সহজ। তাহা ছাড়া পরীক্ষা দ্বারা সহজে ছেলেদের ভাল-মন্দ বিচার করা যায়। ছাত্রদের পরীক্ষার ফল দ্বারা শিক্ষকের কৃতিত্বের বিচার হয়।

পরীক্ষা পাসের সঙ্গে চাকুরি-প্রাপ্তির খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়া অভিভাবকেরা পরীক্ষা পাসের উপরই বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন। যে সব কর্তৃপক্ষ উচ্চশিক্ষার জন্য ছাত্র নির্বাচন করেন বা চাকুরির সংস্থান করেন, তাঁহারাও পরীক্ষায় প্রদত্ত সার্টিফিকেট দ্বারা চালিত হন। যাহা পরীক্ষা করা যায় শিক্ষকদের নজর সেই দিকেই এবং সেইজন্যই তাঁহারা ছাত্রদের স্বাধীনভাবে পড়িবার অভ্যাস জন্মাইবার পরিবর্তে তাহাদের মাথায় কতকগুলি তথ্য প্রবেশ করাইয়া দেন। কোন কোন স্কুলে নীচের শ্রেণীতেও ছাত্রদের note দেওয়া হয় এবং এইরূপ কিছুদিন করার পর দেখা যায় যে, ছাত্রদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার ক্ষমতা এমন কমিয়া যায় যে, তাহারা note দেওয়া না হইলে দুঃখিত হয়।

পরীক্ষার স্থান ঃ

দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও যে-কোন শিক্ষা-ব্যবস্থায় পরীক্ষার বিশেষতঃ বাহিরের পরীক্ষার (external examination) যে প্রয়োজন আছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। বাহিরের পরীক্ষা (external exami-

nation) ছাত্রদের একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের সন্ধান দেয় এবং পরীক্ষার ফল দেখিয়া সমাজও তাহাদের কৃতিত্বের পরিচয় পায়।

বাহিরের পরীক্ষা সকল শিক্ষকের সাধারণ মান নির্দেশ করিয়া দেয়। পরীক্ষার জন্য ছাত্রদের কাজের ভুল বিচার করার সম্ভাবনা হইতেও শিক্ষক মুক্তি লাভ করেন। তাহা ছাড়া বাহিরের পরীক্ষা (external examination দ্বারা এক স্কুলের কাজের সহিত অন্য স্কুলের কাজের সহজে তুলনা করা যায়।

পরীক্ষা একেবারে বাদ দেওয়া সম্ভব নহে; তাই বর্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতির দোষ-ত্রুটি যাহাতে কমানো যাইতে পারে, তাহার জন্য Mudaliar Commission কয়েকটি সুপারিশ করিয়াছেন :—

১। খুব বেশী বাহিরের পরীক্ষা (external examination) থাকা উচিত নহে।

২। বর্তমান Essay-type question-এ পরীক্ষকের খেয়াল-খুশির (subjective element) সুযোগ যথেষ্ট আছে। ইহা যতটা সম্ভব কমানো উচিত। Essay-type question-এর প্রয়োজনীয়তা আছে সত্য, কিন্তু ইহাকেই ছাত্রদের কৃতিত্ব-বিচারের একমাত্র উপায় বলা যাইতে পারে না। Essay-type question ছাত্রদের ভাব-প্রকাশ করিবার ক্ষমতার উপর অযথা গুরুত্ব দান করে। Essay-type question-এর দোষ দূর করিতে হইলে, বাস্তব পরীক্ষারও (objective test) প্রবর্তন করিতে হইবে। তাহা ছাড়া প্রশ্নের ধারাও পাল্টাইতে হইবে। প্রশ্ন এমন হইবে যাহাতে ছাত্রদের মুখস্থ করার প্রবণতা কমে এবং বিচার-শক্তি বাড়ে। খুঁটিনাটির মধ্যে না গিয়া ছাত্রদের যে-কোন জিনিসের সম্বন্ধে একটা ভালরকম ধারণা জন্মে, সেদিকে শিক্ষকের লক্ষ্য থাকা উচিত। একই দিনে তিন ঘণ্টা স্থায়ী দুইটি করিয়া প্রশ্নপত্র দেওয়া অনুচিত।

৩। শিশুর কৃতিত্বের বিচার একমাত্র বাহিরের পরীক্ষার (external examination) ফলের উপর নির্ভর করা উচিত নহে; স্কুলের সাময়িক পরীক্ষা এবং দৈনন্দিন কাজের নথির (Record) কথাও বিবেচনা করা উচিত।

বিদ্যালয়ে পরীক্ষা-পদ্ধতিরও কিছু কিছু পরিবর্তন করা উচিত। বাৎসরিক পরীক্ষার উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া উচিত নহে। কয়েকটি বিদ্যালয়ে বাৎসরিক পরীক্ষা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সাময়িক test এবং সাপ্তাহিক ও মাসিক পরীক্ষার ফলের উপর উপরের শ্রেণীতে উঠা নির্ভর করে। কোন বিদ্যালয়ে সাপ্তাহিক ও মাসিক পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের দৈনন্দিন কাজের বিস্তারিত বিবরণের কথাও বিচার করিয়া promotion দেওয়া হয়। বাৎসরিক পরীক্ষা, সাময়িক পরীক্ষা ও দৈনন্দিন কাজের বিবরণ—এই তিনটি জিনিসের সংযোগের উপর এক শ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীতে promotion নির্ধারিত হওয়া উচিত। তাহা ছাড়া essay-type প্রশ্নের পরিবর্তে objective type প্রশ্ন দেওয়া উচিত।

স্কুলের বিবরণের প্রয়োজনীয়তা ঃ

স্কুলে প্রত্যেক ছাত্র দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কি কাজ করিতেছে, তাহার বিস্তারিত বিবরণী রাখিতে হইবে। এই বিবরণীর সাহায্যে আমরা বুঝিতে পারিব, একটি ছাত্র শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে কি করিয়াছে এবং শিশু-চরিত্রের বিভিন্ন দিকের—যেমন আগ্রহ, অনুভূতি, সামাজিকতা ইত্যাদির কিরূপ বিকাশ ঘটিয়াছে।

বিবরণী কেমন করিয়া রাখিতে হইবে ঃ

শ্রেণী-শিক্ষককেই শিশুদের বিস্তৃত বিবরণী রাখিতে হইবে। শ্রেণী-শিক্ষক তাঁহার শ্রেণীতে প্রত্যহ ২।১ ঘণ্টা পড়ান এবং অন্যান্য শিক্ষক অপেক্ষা ছাত্রদের সহিত বেশী সময় এক সঙ্গে থাকেন। শ্রেণীর ছাত্রদের ঘনিষ্ঠভাবে জানিবার সুযোগ শ্রেণী-শিক্ষক পান।

কোন কোন স্কুলে শ্রেণী-শিক্ষক এক বৎসরের জন্য একটি শ্রেণীর ভার গ্রহণ করেন এবং বৎসরান্তে সেই শ্রেণীর ছাত্রেরা উচ্চতর শ্রেণীতে উঠিলে অন্য শিক্ষকের হাতে তাহাদের ভার পড়ে। আবার কোন কোন স্কুলে শ্রেণীর promotion-এর সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণী-শিক্ষকও উচ্চতর শ্রেণী-শিক্ষকে উন্নীত হন যতদিন না সেই শ্রেণীর ছাত্রেরা বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া যায়। একটি শ্রেণীর ভার শ্রেণী-শিক্ষকের উপর এক বৎসরের জন্যই থাকুক আর কয়েক বৎসরের জন্যই থাকুক, তাহা বড় কথা নহে ; ছাত্রদের সহিত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সংযোগই বাঞ্ছনীয়।

শ্রেণী-শিক্ষকের ব্যবস্থা সব স্কুলেই আছে। কিন্তু সাধারণতঃ বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পড়াইবার প্রথা চালু থাকার জন্য দেখা যায়, শ্রেণী-শিক্ষকের কাজ হইয়া দাঁড়ায় শ্রেণীর হাজিরা বহি (Attendance Register) লেখা ও মাহিনা আদায় করা। শ্রেণী-শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের পার্থক্য বড় করিয়া না দেখিয়া একই শিক্ষকের হাতে উভয় প্রকার কাজেরই ভার দেওয়া যাইতে পারে, যাহাতে শ্রেণী-শিক্ষক অভিভাবকের স্থান লইতে পারেন।

ইহা সত্য যে, ছাত্র-বিবরণী প্রথা প্রবর্তন করিলে শিক্ষকদের দায়িত্ব এবং কাজ দুই-ই বাড়িবে, কিন্তু ইহাতে শিক্ষার কাজ অনেক ভাল হইবে। শিক্ষকেরা একবার ছাত্র-বিবরণী রাখিতে অভ্যস্ত হইলে দেখিবেন যে, ছেলেদের পড়াইতে এবং শ্রেণীর কাজ চালাইতে অনেক সুবিধা হইবে।

অনেকে সন্দেহ করেন যে, শিক্ষকেরা হয়তো বিবরণী ঠিকভাবে রাখিতে পারিবেন না। বিবরণী রাখিবার জন্য অবশ্য শিক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং বিদ্যালয়-পরিদর্শক শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকদের এই বিষয়ে সাহায্য করিবেন ও নির্দেশ দিবেন। প্রত্যেক রাজ্যের Bureau of Education শিক্ষক-শিক্ষণ মহা-

বিদ্যালয়ের সাহায্যে Cumulative Record Form তৈয়ারি করিবেন এবং Intelligence test, Attainment test, Attitude test ও অন্যান্য প্রকার test প্রস্তুত করিবেন।

নম্বর দিবার পদ্ধতি ঃ

বর্তমানে পরীক্ষা করা হয় সংখ্যাসূচক নম্বর দিয়া। ইহার সুবিধা যেমন কিছু আছে, অসুবিধাও তেমনি আছে অনেক বেশী। ইহাতে বহু ছোট ছোট অংশ করিতে হয়; মনে কর, একটি ছেলে ৪৫ নম্বর পাইয়াছে এবং আর একটি ছেলে ৪৬ বা ৪৭ নম্বর পাইয়াছে; ইহাদের পার্থক্য বিচার করা কঠিন। ইহা অপেক্ষা পাঁচটি ধাপযুক্ত সাঙ্কেতিক নম্বর দিবার পদ্ধতি অনেক ভাল। এখানে '*A*' অর্থে খুব ভাল; '*B*' অর্থে ভাল; '*C*' অর্থে মাঝামাঝি; '*D*' অর্থে খারাপ এবং '*E*' অর্থে খুবই খারাপ। এই পদ্ধতিতে পরীক্ষার্থীদের মোটামুটি পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা হয় এবং সেইজন্য সংখ্যাসূচক নম্বর দিবার পদ্ধতি অপেক্ষা ইহা দ্বারা পরীক্ষার্থীদের পার্থক্য বুঝিতে পারা যায়।

লিখিত পরীক্ষাতেও পাঁচটি ধাপযুক্ত সাঙ্কেতিক নম্বর দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু এখানে '*D*' ও '*E*' দ্বারা বুঝাইবে পরীক্ষায় অকৃতকার্যতা। শিক্ষকেরা ইচ্ছা করিলে অবশ্য সাঙ্কেতিক মানকে সংখ্যাসূচক মানে পরিবর্তিত করিতে পারেন। বৃত্তির (Scholarship) জন্য ছাত্র নির্বাচন করিবার সময় সাঙ্কেতিক মানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যাইবে না, কিন্তু অন্য সর্বত্রই ইহা চলিবে।

শেষ পরীক্ষা ঃ

Mudaliar Commission সুপারিশ করিয়াছেন যে, High School বা Higher Secondary School-এর শেষে একটিমাত্র সাধারণ (public) পরীক্ষা থাকিবে। প্রাথমিক মধ্যস্তরের শেষে আর কোন বাহিরের পরীক্ষা থাকিবে না। প্রাথমিক, মধ্য ও অন্য স্তরে

কোন Certificate দিবার দরকার হইলে যে বিদ্যালয়ে শিশু পড়িয়াছে, সেই বিদ্যালয়ই তাহার ব্যবস্থা করিবে।

স্কুল সার্টিফিকেট :

সকল ছাত্রকেই আবশ্যিকভাবে সাধারণ শেষ পরীক্ষা দিতে হইবে না। স্কুলে পাঠ শেষ হইলে ছাত্রেরা স্কুল হইতে একটি সার্টিফিকেট পাইবে, স্কুলে বিভিন্ন বিষয়ে তাহাদের কৃতিত্বের কথা তাহাতে উল্লেখ করা হইবে।

অনেকে বলেন যে, বিদ্যালয়ের Certificate-এর উপর আস্থা স্থাপন করা সম্ভব না হইতে পারে এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মান এক রকম না-ও হইতে পারে। প্রথম দিকে বিদ্যালয়ের মান সব জায়গায় একই রকম না-ও হইতে পারে, কিন্তু যদি বিদ্যালয়ের উপর আমরা আস্থা রাখি, তাহা হইলে বিদ্যালয়ের দেওয়া Certificate মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ, বিশ্ববিদ্যালয় বা বাহিরের কোন সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত Certificate অপেক্ষা বেশী মূল্যবান্ হইবে।

পরীক্ষা পাসের সার্টিফিকেট :

যে সকল ছাত্র স্কুলের শিক্ষা শেষ করিয়া School Final পরীক্ষা দিবে, তাহারা পাস করিলে Secondary Board of Education বা পরীক্ষা-গ্রহণকারী সংস্থার নিকট হইতে Certificate পাইবে। Certificate-এর ধরনও পরিবর্তন হওয়া উচিত। কোন কোন রাজ্যে যে Certificate দেওয়া হয় তাহাতে পরীক্ষার্থী কোন্ বিভাগে পাস করিয়াছে শুধু তাহারই উল্লেখ থাকে ; কোন্ কোন্ বিষয় ছাত্র স্কুলে পাঠ করিয়াছে তাহার কোন বিস্তারিত বিবরণ থাকে না। এই প্রকার Certificate-এ কলেজের এবং যাঁহারা চাকুরি দেন, কাহারও বিশেষ কাজে লাগে না। আবার কোন কোন রাজ্যে যে Certificate দেওয়া হয়, তাহাতে পরীক্ষার্থীরা স্কুলের পরীক্ষা এবং পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় না

এমন সব বিষয়েও কেমন করিয়াছে তাহার উল্লেখ থাকে। তাহা ছাড়া স্কুলের বিবরণী হইতেও দরকারী অংশগুলি উদ্ধৃত করা থাকে।

পরীক্ষা-গ্রহণকারী সংস্থার এমন ধরনের Certificate প্রস্তুত করা উচিত, যাহাতে স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রত্যেক ছাত্রের স্কুল বিবরণীর প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতে পারেন। পরীক্ষা-গ্রহণকারী সংস্থা শেষ পরীক্ষায় ছাত্র যে রকম নম্বর পাইয়াছে, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া স্কুলেই Certificate পাঠাইয়া দিবেন, যাহাতে ছাত্রেরা স্কুল হইতেই Certificate লইতে পারে।

International Team :

বর্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতির যে দোষ-ত্রুটি Mudaliar Commission দেখাইয়াছেন, International Team-ও তাহার সহিত একমত। International Team এই পরীক্ষা-পদ্ধতির আরও কয়েকটি দোষ দেখাইয়াছেন :—

(১) ছাত্র ও শিক্ষকের উপর পরীক্ষার অতিরিক্ত প্রভাবের জন্যই গৃহ-শিক্ষকতার এত প্রসার লাভ ঘটিয়াছে। গৃহ-শিক্ষকতা প্রথা একেবারে উঠাইয়া দেওয়া উচিত। ইহা সকলেই স্বীকার করেন। পরীক্ষা-ব্যবস্থা সংস্কার করার সঙ্গে সঙ্গেই গৃহ-শিক্ষকতার প্রথা আপনা হইতেই উঠিয়া যাইবে।

(২) বর্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতি কার্যকরী করার জন্য যে অর্থ ব্যয় হয়, তাহা দ্বারা শিক্ষা-সংক্রান্ত অনেক ভাল কাজ করা যাইতে পারিত।

পরীক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কার করিবার জন্য Mudaliar Commission যে সুপারিশ করিয়াছেন, International Team তাহা সমর্থন করেন। ইহা ছাড়া International Team নিম্নলিখিত সুপারিশ করিয়াছেন।

১। বাহিরের (external) পরীক্ষায় কমপক্ষে ৬টি বিষয়ের

পরিবর্তে English General Certificate of Education-এর অনুকরণে পরীক্ষার্থীকে একটি বিষয় হইতে যতগুলি সম্ভব বিষয় পরীক্ষা দিতে অনুমতি দেওয়া উচিত।

২। শুধু পরীক্ষার ফলের উপর গুরুত্ব না দিয়া ছাত্রের বিদ্যালয়ে অবস্থানকালের সমস্ত কাজের কথা বিবেচনা করিয়া দেখিয়া Certificate দেওয়া উচিত।

৩। বর্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতির কুফল অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইবে, যদি এক-একটা বিষয়ের পরীক্ষা বিভিন্ন স্তরে কয়েক বৎসর ধরিয়া বিস্তৃত হয়।

এই প্রসঙ্গে International Team কয়েকটি উন্নত পাশ্চাত্য দেশের পরীক্ষা-গ্রহণ-পদ্ধতির কথা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—

(১) ডেনমার্কে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের শেষে একটি বাহিরের পরীক্ষা লওয়া হয়। এখানে শিক্ষকেরা বলিয়া দেন, কোন্ বিষয়ে কতটুকু অংশ পরীক্ষা লওয়া হইবে। বিদ্যালয়-পরিদর্শক শিক্ষক-প্রদত্ত পাঠ্য-সূচী পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া পরীক্ষার বিষয় ঠিক করিয়া দেন। Danish ছাড়া অন্য ভাষা ও গণিতের পরীক্ষা মুখে মুখে হয়। এই পরীক্ষা পরিচালনা করেন পরিদর্শক কর্তৃক নিযুক্ত পরীক্ষক ও যে স্কুলের ছাত্র পরীক্ষা দেয় সেখানকার শিক্ষক। শেষ পরীক্ষায় শতকরা ৫০ নম্বর দেওয়া হয় এবং বাকী ৫০ নম্বর দেওয়া হয় ছাত্রের বিদ্যালয়ের কাজের উপর। শেষ পরীক্ষায় যত নম্বর থাকে তাহার এক-তৃতীয়াংশ ভাগ রাখা হয় লিখিত পরীক্ষার জন্য এবং দুই-তৃতীয়াংশ রাখা হয় মৌখিক পরীক্ষার উপর। একটি Commission লিখিত পরীক্ষা পরিচালনা করেন।

(২) স্কট্‌ল্যাণ্ডে স্কুলের বাহিরের ব্যক্তিদের দ্বারা পরীক্ষা পরিচালিত হয়, কিন্তু যে সকল ছেলেমেয়ে ফেল করে, তাহাদের বিষয় পুনরায়

বিবেচনা করা হয় এবং অন্যায় হইয়াছে বোধ হইলে তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

(৩) আমেরিকায় বাহিরের পরীক্ষার জন্য সাধারণভাবে কোন ব্যবস্থা নাই। কার্যে নিয়োগকারী ব্যক্তি ও সংস্থা বিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত Certificate-কে ছাত্রদের যোগ্যতার পরিচায়ক বলিয়া গ্রহণ করেন। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইবার জন্য কোন রকম external examination-এর প্রয়োজন হয় না; কেবলমাত্র ছাত্রদের কোন্ বিষয়ে পড়া উচিত তাহা স্থির করিবার জন্য কলেজে কতকগুলি test-এর ব্যবস্থা আছে। College Entrance Board যে পরীক্ষা করে, তাহাকে প্রবেশিকা পরীক্ষা না বলিয়া ছাত্রদের শিক্ষা-বিভাগের কোন্ শাখায় যাওয়া উচিত তাহার নির্দেশক বলা যাইতে পারে। New York State-এ Regents Examination নামে এক পরীক্ষা-পদ্ধতি প্রচলিত আছে। কোন স্কুলকেই এই পরীক্ষায় ছাত্র পাঠাইতে বাধ্য করা হয় না। কিন্তু যদি কোন স্কুল এই পরীক্ষার জন্য ছাত্র পাঠায়, সেখানেও ছাত্রদের পরীক্ষা দিতে বাধ্য করা হয় না।

দশম অধ্যায়

অর্থ

মাধ্যমিক শিক্ষা-সংস্কারের জন্য Mudaliar Commission এবং Dey Commission যে সকল সুপারিশ করিয়াছেন, তাহা কার্যকরী করিতে হইলে যে অর্থের প্রয়োজন তাহা আসিবে কোথা হইতে? সংবিধান অনুসারে মাধ্যমিক শিক্ষা-পরিচালনার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে রাজ্য সরকারের; কিন্তু এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন দায়িত্ব নাই একথা বলা যাইতে পারে না। বিশেষ করিয়া যে সকল পরিকল্পনা দ্বারা দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হইবে এবং নাগরিকতা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে, তাহা পরিচালনা করিবার ব্যয়ভার কেন্দ্রীয় সরকারকেও বহন করিতে হইবে।

প্রতি রাজ্যে শিক্ষার জন্য অর্থ সংগৃহীত হয় নিম্নলিখিত ভাবে ঃ—

(১) রাজ্য সরকারের সাহায্য, (২) পৌরসভা (Municipality) এবং অন্যান্য স্থানীয় সংস্থার (Local Bodies) সাহায্য, (৩) বে-সরকারী দান এবং (৪) ছাত্রদের বেতন। স্থানীয় সংস্থা ইচ্ছা করিলে শহরের অধিবাসীদের উপর আয় বা সম্পত্তির উপর সেস্ (cess) বসাইতে পারেন। যদিও স্থানীয় সংস্থার সেস্ (cess) বসাইবার ক্ষমতা আছে তথাপি স্থানীয় সংস্থাগুলিকে এ বিষয়ে অগ্রণী হইতে দেখা যায় না।

শিক্ষার জন্য সকল রাজ্যসরকার সমানভাবে খরচ করেন না। বেসরকারী শিক্ষা-নিকেতনগুলিকে সরকার সাহায্য দান করেন। নিম্নলিখিত যে-কোন কাজের জন্য রাজ্যসরকার বে-সরকারী শিক্ষা-নিকেতনে অর্থ দান করিতে পারেন ঃ—

(১) শিক্ষা-গ্রহণে নিযুক্ত শিক্ষকদের সাহায্য।

(২) ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিবার জন্য ডাক্তারের পারিশ্রমিক।

(৩) অনাথ শিশুদের থাকা-খাওয়ার খরচ।

(৪) বিদ্যালয়-গৃহ বা ছাত্রাবাস নির্মাণ

(৫) আসবাব-পত্র, শিক্ষোপকরণ, রাসায়নিক দ্রব্য এবং পুস্তকাগারের বই।

(৬) বিদ্যালয়-গৃহ, ছাত্রাবাস এবং খেলার মাঠের জন্য জমি সংগ্রহ।

(৭) কারু-শিল্প বা শিল্প-বিষয়ক শিক্ষা।

(৮) বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য সাহায্য (Maintenance grant)।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সমস্ত রাজ্যে সাহায্যদান-প্রথা এক রকম নহে। মাধ্যমিক শিক্ষা-সংস্কারের সুপারিশগুলি কাজে লাগাইতে সরকারী সাহায্যদান-নীতি পরিবর্তন করা প্রয়োজন হইবে।

Federal Board for Vocational Education :

কেন্দ্রে বৃত্তিমূলক শিক্ষার উন্নতির জন্য একটি Federal Board for Vocational Education গঠন করা উচিত। শিক্ষা-বিভাগ, রেলওয়ে ও পরিবহণ বিভাগ, কৃষি ও খাদ্য বিভাগ এবং বাণিজ্য বিভাগ কর্তৃক এই Board-এর খরচ বহন করিতে হইবে। এই সকল বিভিন্ন বিভাগের প্রতিনিধি এবং অর্থ ও প্রতিরক্ষা বিভাগের প্রতিনিধি এই বোর্ডের সভ্য হইবেন। ভারত ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট তিনজন বে-সরকারী ব্যক্তিকে সভ্য মনোনয়ন করিবেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী হইবেন ইহার Chairman এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা-সচিব হইবেন ইহার Secretary বা সচিব। Board বিভিন্ন রাজ্যের প্রয়োজন অনুসারে অর্থ বণ্টন করিয়া দিবেন।

অর্থ-সংগ্রহের অন্য উপায় :

(১) বৃত্তিমূলক শিক্ষা সেস্ (Cess) :—বৃত্তিমূলক শিক্ষা-প্রসারের ফলে শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও পরিবহণের ব্যবস্থার উন্নতি

হইবে; অতএব আশা করা যায় যে, শিল্পপতিরা বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করিতে আপত্তি করিবেন না। Mudaliar Commission সুপারিশ করিয়াছেন যে, বৃত্তিমূলক শিক্ষা সেস্ (Cess) আদায় করা উচিত। এই খাতে যে টাকা উঠিবে তাহা সমস্তই বৃত্তি-মূলক ও কারিগরী শিক্ষার জন্য ব্যয় হইবে। Railway এবং Post ও Telegraph প্রভৃতি যে সকল শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করা বা রাষ্ট্রের আয়ত্তাধীনে আনা হইবে, তাহার আয় হইতেও কিছু টাকা বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষা-বিস্তারের জন্য দেওয়া হইবে।

(২) **জনসাধারণের দান**:—ভারতবর্ষে সর্বপ্রকার শিক্ষা-বিস্তারে জনসাধারণের দান অসামান্য। বর্তমানে অবশ্য এই দানের পরিমাণ নানা কারণে কমিয়া যাইতেছে। শিক্ষা-বিষয়ে জনসাধারণকে টাকা দিবার জন্য নানাভাবে উৎসাহিত করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় সরকার আইন করিয়াছেন, যে টাকা শিক্ষা-সংক্রান্ত কোন বিষয়ে দান করা হয় তাহার উপর আয়কর দিতে হইবে না। Mudaliar Commission সুপারিশ করিয়াছেন যে, যাঁহারা সাধারণ শিক্ষার জন্য ২৫,০০০ টাকা এবং কারিগরী শিক্ষার জন্য ৫,০০০ টাকা দান করিবেন, তাঁহাদিগকে আয়কর (Income Tax) হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইবে।

(৩) **ধর্মীয় ও দাতব্য সম্পত্তি**:—কোন কোন রাজ্যে আইন করা হইয়াছে, ধর্মীয় ও দাতব্য সংস্থার আয়ের কিছু অংশ শিক্ষার জন্য ব্যয় করিতে হইবে। অন্যান্য রাজ্যেও অনুরূপ আইন করিয়া ধর্মীয় ও দাতব্য সম্পত্তির আয় হইতে সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া যে টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে, তাহার একটা অংশ শিক্ষার জন্য ব্যয় করা উচিত।

(৪) **Estate Duty**:—কোন দানশীল ব্যক্তি যদি কোন শিক্ষানিকেতনের জন্য কিছু টাকা বা সম্পত্তি দান করেন, তাহা হইলে ইহার উপর কোন কর বসানো কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত হইবে না।

মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যয়ভার কমাইবার অন্য উপায়ঃ

(১) বিদ্যালয়গুলিকে স্থানীয় কর হইতে অব্যাহতি।

পৌর-প্রতিষ্ঠানগুলি বিদ্যালয়-গৃহ ও খেলার মাঠের জন্য কর আদায় করে। শিক্ষা জাতীয় দায়িত্ব ; কাজেই Municipality ও Corporation বা অন্য কোন পৌর-প্রতিষ্ঠানের উচিত বিদ্যালয়-গৃহ ও খেলার মাঠের উপর হইতে সমস্ত প্রকার কর উঠাইয়া লওয়া।

(২) পুস্তক ও বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামগুলিকে শুল্ক হইতে অব্যাহতি।

যতদিন পর্যন্ত আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও শিক্ষোপকরণ প্রস্তুত না হয়, ততদিন বিদেশ হইতে ইহা আমদানি করিতে হইবে। এইগুলির উপর হইতে আমদানী কর উঠাইয়া লইলে ইহাদের দাম কমিয়া যাইবে।

মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যঃ

দেশের বৃহত্তর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য অধিকতর অর্থ সাহায্য করা। কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য ব্যতীত কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রবর্তন করা সম্ভব নহে। শিক্ষা রাজ্য সরকারের দায়িত্ব হইলেও মাধ্যমিক শিক্ষার কিছু কিছু দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে গ্রহণ করিতে হইবে। নিম্নলিখিত বিষয়ে কেন্দ্রের সাহায্য দেওয়া উচিত ঃ—

(১) বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয় (Multipurpose School) চালু করিবার সময়।

(২) শিক্ষক ও ছাত্রদের জন্য ভাল ভাল পুস্তক লেখাইতে হইলে।

(৩) শিক্ষকদিগের কারিগরী শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষণ-কেন্দ্র খুলিতে হইলে।

(৪) মাধ্যমিক শিক্ষা-সংক্রান্ত কতকগুলি সমস্যা সমাধানের জন্য গবেষণাগার স্থাপন বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য দরকার হইবে ঃ—

(ক) পাঠ্য-সূচী ; (খ) বৃত্তি-বিষয়ক পরামর্শ দান ; (গ) শরীর ও স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান ; (ঘ) শিক্ষা-পদ্ধতি ; (ঙ) পুস্তক-প্রকাশ সম্বন্ধে গবেষণা ও (চ) পরীক্ষা-গ্রহণ-পদ্ধতি।

(৫) ঝালাই পাঠের (Refresher) ব্যবস্থা করা ; প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের Seminar ও Conference.

(৬) শিক্ষামূলক ছবি (film) প্রস্তুত করা ও দেখানো।

(৭) গবেষণামূলক বিদ্যালয়ের উৎসাহ দান।

Mudaliar Commission বলিয়াছেন যে, বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতি করিতে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজনীয়।

Managing Committee and Grant-in-aid ঃ

আমরা পূর্বে দেখিলাম, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অর্থসাহায্য সম্বন্ধে Mudaliar Commission কি সুপারিশ করিয়াছেন। এখন দেখা যাউক, Dey Commission মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিচালক-সমিতি (Managing Committee) ও সাহায্যদান-পদ্ধতি সম্বন্ধে কি মন্তব্য করিয়াছেন।

পশ্চিমবাংলার প্রত্যেক অনুমোদিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিচালক-সমিতি আছে। এই সমিতি কি ভাবে গঠিত হইবে, তাহা নির্ধারণ করিয়া দেওয়ার ভার পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ন্যস্ত ছিল ; এখন এই ভার আছে মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষতের উপর। পরিচালক-সমিতির সকল সভ্যই বে-সরকারী নির্বাচিত ব্যক্তি ; কেবলমাত্র সাহায্য-প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের পরিচালক-সমিতিতে শিক্ষা-অধিকর্তা কর্তৃক মনোনীত একজন করিয়া সভ্য থাকেন। পৌরসভায় নির্বাচনের মতই বিদ্যালয়ের পরিচালক-সমিতির নির্বাচনেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

বিদ্যালয়ের নির্বাচন অনেক ক্ষেত্রে উগ্রদলীয় রাজনীতির লীলা-ক্ষেত্রে পরিণত হয়। স্থানীয় জনসাধারণ এবং শিক্ষকবৃন্দও অনেক সময় এই দলাদলিতে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। কোন কোন ক্ষেত্রে এই কলহ বিচারালয় পর্যন্ত গড়ায়। বিদ্যালয়-পরিচালনার বিষয় লইয়া বিবাদ-বিসম্বাদের ফলে ছাত্রদের পড়াশুনার অনেক ক্ষতি হয়।

High School-এর পৌনঃপুনিক খরচের শতকরা ১১·৫ আসে ব্যক্তিগত দান ও চাঁদা হইতে, শতকরা ১৪·৭৫ আসে সরকারী তহবিল হইতে এবং বাকী টাকা অর্থাৎ শতকরা ৭৩·৭৫ আসে ছাত্র-ছাত্রীদের মাহিনা হইতে। আবার এককালীন দানের কথা বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, বেশীর ভাগ বিদ্যালয়ের গৃহ-নির্মাণ হইয়াছে বে-সরকারী দানের উপর। কাজেই বিদ্যালয়-পরিচালনায় পরিচালক-সমিতির কর্তৃত্ব যে কিছুটা থাকিবে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

পরিচালক-সমিতির ক্ষমতা খর্ব না করিয়াও ইহার গঠনতন্ত্র অপেক্ষাকৃত সহজ করা সম্ভব। নির্বাচন-প্রথা চালু থাকার ফলে বিদ্যালয়ের পরিচালক-সমিতি গঠন ব্যাপারে দলীয় রাজনীতির প্রভাব দেখা যায়; কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে এই দলীয় রাজনীতি মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে। Dey Commission সুপারিশ করেন যে, বিদ্যালয়ের পরিচালক-সমিতি গঠন ব্যাপারে যতদূর সম্ভব নির্বাচন-প্রথা উঠাইয়া দেওয়া উচিত।

Dey Commission-এর মতে পরিচালক-সমিতির কার্যকাল তিন বৎসরের পরিবর্তে পাঁচ বৎসর হওয়া উচিত। পরিচালক-সমিতির ঘন ঘন পরিবর্তন আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে। কার্যকাল বৃদ্ধি করিলে পরিচালক-সমিতি তাঁহাদের পরিকল্পনার রূপ দিবার প্রচুর সময় পাইবেন এবং ইহাতে দলীয় রাজনীতির প্রভাবও কম হইবে বলিয়া আশা করা যায়। Dey Commission-এর মতে পরিচালক-সমিতির কার্যকাল ক্রমশঃ বাড়াইয়া অন্ততঃ ১০ বৎসর করা উচিত।

সাধারণতঃ তিনটি পক্ষ বিদ্যালয়ের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত—(১) পিতামাতা বা অভিভাবক যাঁহাদের ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ে পড়ে; (২) শিক্ষক যাঁহারা ছাত্রদের পড়ান; (৩) শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিগণ। বিদ্যালয়ের পরিচালক-সমিতিতে এই তিন দলেরই প্রতিনিধি থাকা উচিত। শিক্ষকেরা মোটামুটি স্থায়িভাবে থাকেন, কিন্তু অভিভাবকদের পরিবর্তন হয়। প্রথম দুই পক্ষের প্রতিনিধিদের যে পরিচালক-সমিতির মধ্যে থাকা উচিত, সে বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। যত গোলমাল তৃতীয় পক্ষ লইয়া—বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, শুভানুধ্যায়ী, যাঁহারা এককালীন মোটা রকম দান করিয়াছেন এবং যাঁহারা নিয়মিত চাঁদা দেন। বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষাপর্ষতের মতে যাঁহারা এককালীন ১০,০০০ টাকা বা ১৫,০০০ টাকা মূল্যের সম্পত্তি দান করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে শুভানুধ্যায়ী বা Benefactor বলা যাইতে পারে। Dey Commission-এর মতে এই রকম ব্যক্তিকেই আজীবন পরিচালক-সমিতির সভ্য করা উচিত অথবা তাঁহার জীবিতকালে তাঁহারই মনোনীত কোন ব্যক্তি পরিচালক-সমিতির সভ্য হইতে পারিবেন। অতি অল্পসংখ্যক বিদ্যালয়ে এই রকম শুভানুধ্যায়ী আছেন এবং কোন বিদ্যালয়েই সাধারণতঃ একজনের বেশী এই রকম শুভানুধ্যায়ী নাই। যদি থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সকলেই পরিচালক-সমিতির আজীবন সভ্য হইবেন।

আবার যাঁহারা নগদ ৫০০ টাকা কিংবা ১,০০০ টাকা মূল্যের সম্পত্তি বিদ্যালয়ের জন্য দান করেন, তাঁহাদিগকে দাতা (Donor)-শ্রেণীভুক্ত করা হয়। পরিচালক-সমিতিতে দাতার জন্য একটি আসন নির্দিষ্ট থাকা উচিত। দাতার নামের একটি তালিকা বিদ্যালয়ে রাখিতে হইবে এবং নির্বাচনের পূর্বেই প্রত্যেক দাতাকে তাঁহার দেয় চাঁদা সম্পূর্ণ দিতে হইবে। দাতাকে সভ্য নির্বাচন করিবেন অন্যান্য দাতারা। যদি একজন

মাত্র দাতা থাকেন, তাহা হইলে তিনি একবার সভ্য হইতে পারিবেন। যাঁহারা বিদ্যালয়ের জন্য নিয়মিত চাঁদা দেন তাঁহাদের প্রতিনিধিও পরিচালক-সমিতিতে থাকিবেন। যদি ১০ জন চাঁদাদাতা থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা পরিচালক-সমিতির একজন সভ্য নির্বাচন করিতে পারিবেন। বৎসরে অন্ততঃ ১২ টাকা চাঁদা না দেওয়া থাকিলে কেহ নির্বাচন-প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় পদাধিকারবলে Secretary বা সচিব হইবেন। বিদ্যালয়ে ১২ জনের বেশী স্থায়িভাবে নিযুক্ত শিক্ষক থাকিলে পরিচালক-সমিতিতে দুইজন শিক্ষক সভ্য নির্বাচিত হইবেন, কিন্তু বিদ্যালয়ে ১২ জনের কম শিক্ষক থাকিলে একজন শিক্ষক সভ্য নির্বাচিত হইবেন। একজন শিক্ষক দুইবার মাত্র সভ্য নির্বাচিত হইতে পারিবেন।

মাধ্যমিক শিক্ষা পরামর্শ-সমিতির আঞ্চলিক শাখার সুপারিশ অনুযায়ী পশ্চিমবাংলা সরকার শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিকে সভ্য মনোনীত করিতে পারিবেন।

পরিচালক-সমিতির সভ্যেরা অভিভাবকদের মধ্যে তিনজনকে সভ্য মনোনীত করিবেন। যে সকল বিদ্যালয়ে তিন শতের কম ছাত্র আছে, সেখানে দুইজন অভিভাবক সভ্য থাকিবেন এবং তিন শতের অধিক ছাত্র থাকিলে তিনজন অভিভাবক সভ্য থাকিবেন।

যদি কোন ক্ষেত্রে ধর্মযাজকেরা (Missionary) কোন বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তদন্ত করিয়া পরিচালক-সমিতি একজন ধর্মযাজক সভ্য মনোনীত করিতে পারেন।

Dey Commission-এর সুপারিশমতো কাজ হইলে বিদ্যালয়ের পরিচালক-সমিতি ৭।৮ জন সভ্য লইয়া গঠিত হইবে এবং এই সমিতির সভ্য হইবেন তাঁহারাই যাঁহাদের বিদ্যালয়-পরিচালনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ আছে।

পরিচালক-সমিতির সভ্যবৃন্দ তাঁহাদের মধ্যে একজনকে অধ্যক্ষ (সভাপতি) ও একজনকে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচন করিবেন। প্রধান শিক্ষক মহাশয় পদাধিকারবলে সচিব থাকার ফলে পরিচালক-সমিতির কাজ নিরঙ্কুশভাবে চলিবে বলিয়া আশা করা যায়।

সমস্ত পরিচালক-সমিতিকেই মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষতের সভাপতির অনুমোদন লাভ করিতে হইবে।

পরিচালক-সমিতির কাজ সম্বন্ধে Dey Commission নিম্নলিখিত সুপারিশ করিয়াছেন :—

(ক) পরিচালক-সমিতি শিক্ষকদের বেতন, ছুটি, পেনশন, প্রভিডেণ্ট ফণ্ড প্রভৃতি সংক্রান্ত নিয়মাবলী স্থির করিবেন। এই নিয়মাবলী মাধ্যমিক শিক্ষা-পর্ষৎ কর্তৃক অনুমোদিত হইবে এবং যতদূর সম্ভব সকল বিদ্যালয়ের নিয়মাবলী একই রকম হইবে।

(খ) বিদ্যালয় পরিচালনা করিবার জন্য উপযুক্ত Reserve Fund-এর ব্যবস্থা করা পরিচালক-সমিতির একটি প্রধান কাজ হইবে।

(গ) বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য শ্রেণীকক্ষ ও খেলার জন্য মাঠের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(ঘ) সমগ্র বিদ্যালয়ে কত ছাত্র থাকিবে এবং প্রতি শ্রেণীতে কত ছাত্র থাকিবে, এ সম্বন্ধে পর্ষতের নিয়মকানুন মানিয়া চলিতে হইবে।

(ঙ) পর্ষতের সমর্থনসাপেক্ষে পরিচালক-সমিতি ছাত্রদের বেতন ও অন্যান্য ফি নির্ধারণ করিবেন।

(চ) পরিচালক-সমিতি বিদ্যালয়ের আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখিবেন এবং বিদ্যালয়-পরিচালনার জন্য দায়ী থাকিবেন। Dey Commission সুপারিশ করিয়াছেন যে, প্রত্যেক বিদ্যালয় ও প্রত্যেক পরিচালক-সমিতিকে রেজিস্টারি করিতে হইবে।

Grant-in-aid System (বিত্তালয়ে সাহায্যদান-পদ্ধতি) :

১৯৪৮ সালের পূর্বে বিত্তালয়গুলিকে এককালীন কিছু কিছু সাহায্য দেওয়া হইত। ১৯৪৮ সালের পর হইতে পশ্চিমবাংলায় নূতন সাহায্য-দান-পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছে। বিত্তালয়ের আয় ও ব্যয়ের মধ্যে যে পার্থক্য থাকে, পর্যৎ হইতে সমগ্র ঘাট্‌তি পূরণ করা হয়। মাধ্যমিক বিত্তালয়ে এইভাবে ঘাট্‌তি অনুসারে সাহায্য করার ফলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বৎসরে প্রায় ৩০,০০,০০০ টাকা ব্যয় করিতে হয়।

মাধ্যমিক বিত্তালয়গুলির সাহায্যের পরিমাণ এক নহে। কোন কোন বিত্তালয় বৎসরে ২০০ টাকা সাহায্য পাইয়াছে, আবার কোন বিত্তালয় বৎসরে ১৬,০০০ টাকা পর্যন্ত সাহায্য পাইয়াছে। সকল মাধ্যমিক বিত্তালয়ে যেমন সমান পরিমাণ সাহায্য দেওয়া হয় না, তেমনি শিক্ষক ও ছাত্রসংখ্যাও সকল বিত্তালয়ে একরূপ নহে।

Dey Commission এই প্রসঙ্গে মাদ্রাজ, বোম্বাই ও উত্তর প্রদেশের বিত্তালয়ে সাহায্যদান-পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন :—

মাদ্রাজে প্রত্যেক বিত্তালয়ে আগেকার বৎসরে যাহা খরচ হইয়াছে তাহার ⅔ অংশ সরকার সাহায্যরূপে দান করেন। অবশ্য এই সমস্ত খরচ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া চাই।

বোম্বাই রাজ্যে স্থানীয় সম্পত্তি হইতে বিত্তালয়ের জন্য যাহা খরচ হয়, তাহার অর্ধেক অথবা বিত্তালয়ে আগেকার বৎসরে যত খরচ হইয়াছে, তাহার এক-তৃতীয়াংশ সরকার সাহায্যরূপে দান করেন।

উত্তর প্রদেশে বিত্তালয়ের ঘাট্‌তি অথবা বিত্তালয়ের সমগ্র খরচের অর্ধেক ইহার মধ্যে যাহা কম হয়, সরকার সাহায্যরূপে তাহাই দান করেন।

মাদ্রাজ, বোম্বাই ও উত্তর প্রদেশে বিত্তালয়ের সমগ্র ঘাট্‌তি সরকার পূরণ করেন না। এই তিনটি প্রদেশের সহিত তুলনা করিলে পশ্চিম বাংলায় সরকার যথেষ্ট অর্থই সাহায্য করেন। এই বিষয়ে আর

একটা জিনিসও লক্ষ্য করিবার আছে। মাদ্রাজ, বোম্বাই ও উত্তর প্রদেশে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পূর্ব বৎসর কি খরচ করিয়াছেন, তাহার উপর সরকারের সাহায্যের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। কিন্তু বাংলা দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির এমনই অবস্থা যে, সরকারের সাহায্য না পাইলে শিক্ষকদের মাসিক বেতন দেওয়াও সম্ভব হয় না। খুব কম বিদ্যালয়েই বাড়তি টাকা আছে; ১,০০০ টাকা Reserve Fund-ও অনেক বিদ্যালয়ের নাই। বিদ্যালয়ের জন্য বে-সরকারী ব্যক্তিগত দানও দিন দিন কমিয়া আসিতেছে। কাজেই ঠিক সময়ে সরকারী সাহায্য না পাইলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের শিক্ষকদের বেতন দেওয়াই কঠিন।

কিন্তু বর্তমান সাহায্য দান-পদ্ধতির কতকগুলি দোষও দেখা যায়। এই পদ্ধতি নীতি-বিগর্হিত, অসন্তোষজনক এবং সহজে কার্যকরী করা যায় না। পরিচালক-সমিতি এই প্রকার সাহায্যদান-পদ্ধতির জন্য অনেক সময় দুর্নীতি অবলম্বন করেন এবং মিথ্যা হিসাব দেখাইয়া ঘাট্‌তি প্রমাণ করেন। সরকার হইতে ঘাট্‌তি টাকা দেওয়া হয় বলিয়া বে-সরকারী দান দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। ঘাট্‌তির উপর সাহায্য দেওয়ার ফলে বিদ্যালয় কোন নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে পারে না। তাহা ছাড়া এই পদ্ধতিতে যেখানে পরীক্ষায় ফল ভাল হয় এবং যেখানকার পরিচালন-ব্যবস্থাও সুন্দর, সেই সব বিদ্যালয়ে কোন উৎসাহ দেওয়ারও ব্যবস্থা নাই।

ঘাট্‌তি হিসাব করা যে সময়সাপেক্ষ তাহাই নহে; ঘাট্‌তির উপর সাহায্যদান-প্রথাই ত্রুটিপূর্ণ। অনেক সময় মাসের পর মাস কাটিয়া যায়, বিদ্যালয়ে সরকারী সাহায্য তখনও আসিয়া পৌঁছায় না; তাহার কারণ সরকারী কর্মচারীরা ঘাট্‌তির হিসাব করিয়া উঠিতে পারেন না। দেরীতে সরকারী সাহায্য পৌঁছাইবার ফলে শিক্ষকেরা নিয়মিত সময়ে বেতনও পান না।

Dey Commission-এর মতে সাহায্যদানের বর্তমান পদ্ধতি পরিবর্তন করা দরকার। বিদ্যালয়ের খরচের শতকরা ৭০ ভাগ শিক্ষকের বেতন দিতে ব্যয় হইয়া যায়। বিদ্যালয়ের সাহায্য শিক্ষকের বেতনের উপর ধার্য করা উচিত। কিন্তু তাহা করিতে হইলে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন ও যোগ্যতা একই রকম হওয়া উচিত। কিন্তু এ বিষয়ে পশ্চিমবাংলায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্য বেশী দেখা যায়।

কিন্তু যতদিন পর্যন্ত এই সাহায্যদান-পদ্ধতির পরিবর্তন সম্ভব না হইতেছে, ততদিন পর্যন্ত ইহার গলদগুলি যাহাতে বাড়িতে না পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। Dey Commission সুপারিশ করিয়াছেন যে, আগামী তিন বৎসরের সাহায্যের পরিমাণ গত দুই বৎসরে যে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে তাহার উপর হিসাব করিতে হইবে। ইহার সঙ্গে শিক্ষকদের বেতন-বৃদ্ধি বাবদ শতকরা ৫ টাকা এবং বিদ্যালয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাবদ শতকরা ১৫ টাকা হিসাবে বেশী করিয়া ধরিতে হইবে। আগামী তিন বৎসরে কোন্ বিদ্যালয় কি পরিমাণ সরকারী সাহায্য পাইতে পারে, তাহা আগে হইতেই জানাইয়া দেওয়া উচিত। বৎসরে ছয় মাসের দুই কিস্তিতে বিদ্যালয়-গুলিকে সাহায্য করা উচিত।

মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেমন হইবে ?

আমাদের দেশের বর্তমান মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি অন্যান্য প্রগতি-শীল দেশের তুলনায় অনেক পিছাইয়া আছে। দেশের মনীষীরা ইহার দোষ-ত্রুটি দেখাইয়াছেন, বিভিন্ন কমিশন ও কমিটি বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া ইহার উন্নতির পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। তবুও আমরা যে খুব অগ্রসর হইয়াছি তাহা মনে করিবার কোন

কারণ নাই। মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেমন হওয়া উচিত, তাহার একটা চিত্র ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

উপযুক্ত পরিবেশ ঃ

আনন্দময় পরিবেশই হইতেছে বিদ্যালয়ের প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন। কয়েকটি ভাল বিদ্যালয়ের কথা বাদ দিলে দেখা যায় যে, বেশীর ভাগ বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পরিবেশ এমনই নৈরাশ্যজনক যে তাহাতে ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয়ের জন্য আদৌ গৌরব বোধ করিতে পারে না। একথা সত্য যে, এদেশে অনেক বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা এতই খারাপ যে ভাল বাড়ী বা আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করা তাহাদের পক্ষে একেবারেই সম্ভব নহে। কিন্তু তাই বলিয়া বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পরিবেশ সুন্দর করা যায় না, একথাও বিশ্বাস করা কঠিন। যদি বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ উৎসাহী ও চিন্তাশীল হন এবং শিক্ষক ও ছাত্রেরা যদি কর্তৃপক্ষের সহিত সহযোগিতা করে, তাহা হইলে বিদ্যালয়ের পরিবেশ সহজেই বদলাইয়া দেওয়া যায়। উৎসাহ দিলে বিদ্যালয়ের ছাত্রেরাই ছোট-খাট মেরামত, দেওয়ালে চুন দেওয়া, আসবাবপত্র পালিশ করা এবং শ্রেণীকক্ষের দেওয়ালে চার্ট, ছবি, মহাপুরুষদের বাণী টাঙ্গানো এবং বিদ্যালয়ের বাগান ও প্রাঙ্গণ পরিষ্কার রাখা প্রভৃতি কাজ অতি আনন্দের সহিত করিতে পারে। বিদ্যালয়কে যদি সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া জনসাধারণ মনে করিতে পারে, তাহা হইলে অর্থের অভাবে বিদ্যালয়ের উন্নতি কখন ব্যাহত হইতে পারে না। সুন্দর ও প্রয়োজনীয় জিনিস নিজের চেষ্টায় তৈয়ারি করা শিক্ষার একটি অঙ্গ ; কাজেই সব দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিতে গেলে বিদ্যালয়কে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করিবার ভার ছাত্রদের উপরই ছাড়িয়া দেওয়া উচিত।

পাঠ্য-বহির্ভূত কার্যাবলী ঃ

শিশুর সমগ্র ব্যক্তিত্ব বিকাশ করিতে হইলে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে নানারকম কাজের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন রুচি ও প্রবৃত্তির খোরাক যোগাইবার জন্য বিদ্যালয়ে কি কি পাঠ্য-বহির্ভূত কাজ দেওয়া যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে পরিকল্পনা প্রস্তুত করা প্রয়োজন। আমাদের সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, শিশুদের কতকগুলি তথ্য পরিবেশন করাই বিদ্যালয়ের একমাত্র কাজ নহে। বিদ্যালয় হইতেছে সমাজের একটি ছোট-খাট সংস্করণ এবং এখানে শিশুদের জীবন-ধারণ করিবার পদ্ধতি সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা জন্মাইয়া দিতে হইবে। ভবিষ্যতের মাধ্যমিক বিদ্যালয় হইবে কর্মকেন্দ্রিক, কারণ কাজের মাধ্যমেই প্রকৃত শিক্ষা হয়। কাজের মধ্যেই শিশু নিজেকে আবিষ্কার করিতে পারে। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার আর একটা দিকও আছে। শ্রেণীকক্ষ ও খেলার মাঠের পার্থক্য লোপ পায় এবং সমস্ত কাজই খেলার মতো আনন্দের সহিত করা যায়। যদি কতকগুলি শ্রেণীতে নিছক পড়িবার ব্যবস্থা থাকে এবং বাকী সময়ে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে খেলাধূলার ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে শিক্ষার কাজ খুব আগাইয়া যাইবে না।

পাঠ্য-বহির্ভূত কাজ দুই-একটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নহে। শিশুদের জীবনের সব দিকেরই অভিব্যক্তির সুযোগ যাহাতে মিলে, সেই দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বিদ্যালয়ে এমন সব কাজের ব্যবস্থা থাকা উচিত, যাহাতে বিভিন্ন শক্তি ও রুচিসম্পন্ন শিশুরা নিজ নিজ অভিরুচি অনুসারে বিভিন্ন কাজে মন দিতে পারে।

কারু-শিল্প ও উৎপাদনাত্মক কাজ ঃ

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদিগকে কারু-শিল্প ও উৎপাদনাত্মক কর্ম প্রবর্তন করার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। শিক্ষা-

মূলক উৎপাদনাত্মক কার্যই হইতেছে শিক্ষার প্রকৃত মাধ্যম। প্রত্যেক সুপ্রতিষ্ঠিত ও স্বচ্ছল বিদ্যালয়ে ছোট-খাট কারখানা ও কারু-শিল্পের জন্য পৃথক ঘর থাকা উচিত। এখানে শিশুরা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে এবং বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য তৈয়ারি করিতে শিখিবে। যে সব ছাত্র-ছাত্রী কৃষি, ইঞ্জিনিয়ারিং, গৃহ-বিজ্ঞান-প্রভৃতি বিষয় পড়িতে চায়, তাহাদের কারু-শিল্পের ঘর ও কারখানার বিশেষ প্রয়োজন আছে। যে সব ছাত্র-ছাত্রী বিজ্ঞান, মানবতা ও কলা-বিভাগে পড়িবে, কারু-শিল্প তাহাদেরও উপযুক্ত বাস্তব অভিজ্ঞতা দান করিবে। বিদ্যালয়ের গবেষণাগারে শিক্ষকের পরিচালনায় ধরা-বাঁধা কয়েকটি পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াই সাধারণতঃ কাজ শেষ হয়। কিন্তু ভবিষ্যতের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গবেষণাগারে ছাত্রদের নূতন নূতন জিনিস আবিষ্কার করার আনন্দ লাভ করিবার সুযোগ দিতে হইবে।

বিদ্যালয়ের পাঠাগার :

নূতন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভাল পাঠাগার থাকিবে। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ও সাহিত্য পড়িবার সময় যে-সব সমস্যা সচরাচর দেখা দেয়, সেগুলির আশু সমাধান সব সময়ে পাঠ্য-পুস্তকের সাহায্যে হইবে এরূপ আশা করা যায় না। শিক্ষক মহাশয় ছাত্রদের পাঠাগারে লইয়া গিয়া পুস্তকের সাহায্যে বিভিন্ন প্রকার সমস্যার সমাধান করিতে উৎসাহিত করিবেন।

বিদ্যালয় হইবে সমাজের প্রাণকেন্দ্র :

শিক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কারের প্রথম ধাপই হইবে জীবনের সঙ্গে শিক্ষার এবং সমাজের সঙ্গে বিদ্যালয়ের সংযোগ স্থাপন করা। কেবল পুঁথিগত বিদ্যাশিক্ষা ও কতকগুলি অবাস্তব বিষয়ে জ্ঞান দিয়াই বিদ্যালয়ের কাজ শেষ হইবে না। এখানে শিশুরা বাস্তব ক্ষেত্রে অপরের সহিত সহযোগিতা করিতে, সমষ্টির জন্য ব্যক্তির স্বার্থ ত্যাগ করিতে এবং

শৃঙ্খলার সহিত কার্য করিতে শিখিবে। পুরস্কার ও তিরস্কারের সাহায্যে বাহির হইতে চাপানো শৃঙ্খলার পরিবর্তে বিদ্যালয়ের ছাত্রেরাই যাহাতে বিদ্যালয়ের সমস্ত অনুষ্ঠান ভালভাবে চালাইতে পারে এবং সকল বিষয়ে শৃঙ্খলা বিধান করিতে পারে, সেই দিকে শিক্ষকদের লক্ষ্য রাখা উচিত। শিক্ষকেরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, ছাত্রেরা যখন কোন নাটক অভিনয় করে বা অন্য কোন উৎসব উদ্‌যাপন করে, তখন শৃঙ্খলা বিধান করিবার কোন প্রশ্ন উঠে না। সেইরূপ শিশুদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে এমনভাবে বিদ্যালয়ের কর্মসূচী প্রস্তুত করিতে পারিলে ছাত্রদের উপরে বাহির হইতে বিধিনিষেধ চাপাইবার কোন প্রয়োজন হইবে না।

বিদ্যালয় হইবে সমাজের মধ্যেই একটি ক্ষুদ্র সমাজ এবং ক্ষুদ্র ও বৃহত্তর সমাজের পরস্পর সহযোগিতার উপর নির্ভর করিবে বিদ্যালয়ের সাফল্য। ইহার দুই রকম ফল হইবে। গৃহে ও সমাজ-জীবনে যে সকল সমস্যার উদ্ভব হইবে এবং ছাত্রেরা যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিবে, তাহার উপর ভিত্তি করিয়া শিক্ষা দান করিলে সেই শিক্ষাই হইবে প্রকৃত শিক্ষা। অপর দিকে বিদ্যালয়ে শিশু যে শিক্ষা লাভ করিবে, তাহা তাহার প্রাত্যহিক জীবনকে প্রভাবান্বিত করিবে। যদি বিদ্যালয়ের নিকটে কোন জায়গায় ময়লা জমিয়া থাকে এবং তাহাতে স্বাস্থ্যের হানি হইবার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তাহা হইলে শিক্ষক ও ছাত্রদের উচিত সমাজের লোকদের এ সম্বন্ধে অবহিত করা এবং তাহাদের সহযোগিতায় ঐ ময়লা পরিষ্কার করা। আবার সমাজের মধ্যে অনেক লোক আছেন যাহাদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আছে। এই সকল ব্যক্তিদের মাঝে মাঝে বিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের অভিজ্ঞতা শিশুদের নিকট বর্ণনা করিতে অনুরোধ করা যাইতে পারে। এইভাবে সমাজ ও বিদ্যালয়ের

মধ্যে যে প্রাচীর গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা ক্রমশঃ ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

শিক্ষকদের নূতন দৃষ্টিভঙ্গি :

শিক্ষক মহাশয়দেরও দৃষ্টিভঙ্গি বদলাইতে হইবে। তাঁহারা যেন মনে না করেন যে, কোন রকমে জীবিকা অর্জন করিবার উপায় হিসাবেই তাঁহারা শিক্ষকতা করিতেছেন। সমাজের একটি বিশেষ মঙ্গলকর কাজে তাঁহারা ব্যাপৃত আছেন, এই মনোভাব লইয়াই তাঁহাদের কাজ করিতে হইবে।

শিক্ষক মহাশয়দের মনে করিতে হইবে যে, তাঁহারা একই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত একটি দল এবং প্রধান শিক্ষক মহাশয় অধিকতর অভিজ্ঞতার জন্য তাঁহাদের নেতা নির্বাচিত হইয়াছেন। যখন বিদ্যালয়ের কোন সমস্যা দেখা দিবে, তখন সকল শিক্ষক একত্রে পরামর্শ করিয়া ইহার সমাধান করিবেন। মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা-বিষয়ক পুস্তক পাঠ করিয়া তাঁহারা নিজেদের মনকে উন্মুক্ত ও সচেতন রাখিবেন। ভাল শিক্ষক ছাত্রদের ভক্তি ও ভালবাসা লাভ করিবার চেষ্টা করিবেন এবং ছাত্রদের সমস্ত সমস্যা সহানুভূতির সহিত সমাধান করিবার চেষ্টা করিবেন।

বিদ্যালয়ের পরীক্ষা-পদ্ধতিরও পরিবর্তন করিতে হইবে। এখন পরীক্ষার তাগিদেই শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রধানতঃ নিয়ন্ত্রিত হয়। School Final পরীক্ষার উপর শিক্ষকদের কোন হাত নাই—ইহা সত্য; কিন্তু বিদ্যালয়ের নীচের শ্রেণীর পরীক্ষা-পদ্ধতি পরিবর্তন করা কঠিন নহে। বিদ্যালয়ের শিশুদের দৈনন্দিন কর্ম-তালিকার পূর্ণ বিবরণ রাখিয়া তাহার উপর গুরুত্ব দিতে হইবে এবং বিদ্যালয়ে ছাত্রদের উন্নতি-অবনতির বিচার করিবার সময় পাঠ্য-বিষয় ছাড়া তাহাদের সামাজিকতা, সহযোগিতা, প্রবৃত্তি, নেতৃত্ব প্রভৃতি গুণের বিকাশ হইয়াছে কি না তাহাও দেখিতে হইবে। শিক্ষকদের দৃষ্টিভঙ্গি

পরিবর্তিত হইলেই পরীক্ষা-পদ্ধতিরও পরিবর্তন হইবে আশা করা যায়।

বিদ্যালয়ে স্বাধীনতা ঃ

বর্তমান বিদ্যালয়ে যে পরিমাণ স্বাধীনতা আছে, ভবিষ্যতে বহুমুখী বিদ্যালয়ে বা Higher Secondary School-এ তাহার চেয়ে বেশী স্বাধীনতা আসিবে বলিয়া আশা করা যায়। প্রধান শিক্ষকেরা অভিযোগ করেন যে, শিক্ষা-বিভাগীয় আইনকানুনের নাগপাশে তাঁহারা এমনভাবে জড়িত যে, বিদ্যালয়ে কোন নূতন জিনিস প্রবর্তন করিতে তাঁহারা পারেন না। সহকারী শিক্ষকেরা আবার এমন অভিযোগ করেন যে, প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের জন্য তাঁহারা শ্রেণীকক্ষে নূতন কোন ভাবধারা রূপায়িত করিতে সক্ষম নহেন। পাঠ্য-সূচী প্রস্তুত, পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন এবং শিক্ষা-পদ্ধতি বিষয়ে শিক্ষক মহাশয়েরা সম্পূর্ণ স্বাধীন নহেন ইহা সত্য, কিন্তু ইচ্ছা করিলে শিক্ষক মহাশয়েরা অনেক কিছু করিতে পারেন। ছাত্রেরা যাহাতে পাঠাগারে অধিকতর সুযোগ লাভ করিতে পারে এবং ভাল ভাল পুস্তক পাঠ করিতে পারে, শিক্ষকদের সেদিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত। শ্রেণীকক্ষে এমন পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত, যাহাতে শিশুরা অধিকতর স্বাধীনভাবে নিজেদের শক্তি ও যোগ্যতা অনুসারে পাঠে অগ্রসর হইতে পারে। পাঠ্য-বহির্ভূত বিভিন্ন কার্যের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা করিবার ভার ছাত্রদের উপর দিতে হইবে।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, নূতন বিদ্যালয় হইবে একটি ছোট-খাট সমাজ। এখানে ছাত্রেরা দলবদ্ধভাবে কাজ করিবে এবং কাজের মাধ্যমেই তাহাদের জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিবার উপযুক্ত শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

একাদশ অধ্যায়

(১) মেকলের নির্দেশ

বর্তমানে ভারতে যে শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু আছে, তাহার গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন মেকলে সাহেব। শিক্ষা সম্বন্ধে ১৮৩৫ সালে মেকলে যে নির্দেশনামা দিয়াছিলেন, ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে তাহা একটি বিখ্যাত ঘটনা বলা যাইতে পারে।

মেকলের নির্দেশনামার (Minute) প্রধান প্রধান সুপারিশগুলি কি ছিল, তাহা দেখা যাউক।

"ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ১৮১৩ সালে একটি আইন পাস করানো হয়। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, সাহিত্যের উন্নতি এবং শিক্ষিত ভারত-বাসীদের উৎসাহ-দান এবং ব্রিটিশ-অধিকৃত এলাকার অধিবাসীদের মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞান-বিস্তারের জন্য কিছু টাকা বরাদ্দ করা হইবে। অনেকের ধারণা, সাহিত্য বলিতে আরবী ও সংস্কৃত ভাষার কথা বলা হইয়াছে এবং শিক্ষিত ভারতবাসী তাঁহাদেরই বলা হইয়াছে যাঁহারা হিন্দুদের পবিত্র শাস্ত্রগুলি অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং দেবতাদের ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন। কিন্তু মেকলের মতে Parliament Act-এ শিক্ষিত ভারতবাসী বলিতে ইংরাজী ও ফরাসী ভাষার শিক্ষিত ব্যক্তিকে বুঝাইয়াছে।

"প্রাচ্য শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতি অনুরাগী ব্যক্তিরা বলেন যে, এ পর্যন্ত আরবী ও সংস্কৃত শিক্ষার জন্য যে টাকা ব্যয় হইয়া আসিতেছিল, তাহা অন্য বিষয়ে ব্যয় করিলে জনসাধারণের মনে ক্ষোভ হইবে। কিন্তু মেকলে এই মত ঠিক বলিয়া মনে করেন না। মেকলে মনে করেন যে, শিক্ষা-বিস্তারের জন্য ১৮৩৫ সালের এ্যাক্ট (Act)-এ যে এক-লক্ষ টাকার বরাদ্দ করা হইয়াছে, তাহা সপরিষদ্ বড়লাট বাহাদুর যে-কোন উপযুক্ত শিক্ষা-ব্যবস্থার জন্যই খরচ করিতে পারেন। এই টাকাটা

লাট সাহেব ভারতীয়দের মানসিক উন্নতির জন্য খরচ করিবেন। এখন দেখিতে হইবে, কোন্ বাবদে টাকাটা ব্যয় করিলে ইহার সদ্ব্যবহার করা হইবে।

"এখন কথা হইতেছে, কোন্ ভাষার উন্নতির জন্য অর্থ ব্যয় করা হইবে—ইংরাজী কিংবা আরবী ও সংস্কৃত। এক দিকে ইংরাজী এবং অপর পক্ষে সংস্কৃত ও আরবী ভাষার মধ্যে কোন্‌টি ভাল? কমিটির সভ্যদের অর্ধেকের মত এই যে, ইংরাজী ভাষার জন্যই অর্থ ব্যয় করা উচিত এবং অপর অর্ধেকের মত হইতেছে যে, আরবী ও সংস্কৃত ভাষার জন্যই অর্থ ব্যয় করা উচিত।" মেকলে বলেন যে, তাঁহার মতে "ইউরোপের কোন পাঠাগারের একটা shelf-এর মূল্য সমস্ত আরব ও ভারতবর্ষের সাহিত্য অপেক্ষা বেশী।" মেকলে সাহেব আরও বলেন, প্রাচ্য দেশের সাহিত্যের মধ্যে কাব্যই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু তবুও পাশ্চাত্ত্য দেশের কাব্যের সহিত প্রাচ্য দেশের কাব্যের তুলনাই হইতে পারে না। সমস্ত সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে ইতিহাসের যে উপাদান সংগ্রহ করা যাইতে পারে, তাহা ইংলণ্ডে Preparatory School পাঠ্য যে-কোন পুস্তকের সংক্ষিপ্ত সংস্করণের তথ্য অপেক্ষাও কম। দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধেও ভারতের অবস্থা ভাল নহে।

"এখন সমস্যা দাঁড়াইল এই যে, একটা জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে অথচ তাহাদের মাতৃভাষা যথেষ্ট সমৃদ্ধ নহে। অতএব বাধ্য হইয়া তাহাদের কোন বৈদেশিক ভাষা শিখাইতে হইবে। ইংরাজী পৃথিবীর মধ্যে একটি উন্নত ভাষা। তাহা ছাড়া ইহা শাসকদের ভাষা। ভারতীয়দের মধ্যেও যাঁহারা পদমর্যাদাসম্পন্ন তাঁহারা এবং সরকারী অফিসে যাঁহারা কর্ম করেন তাঁহারা ইংরাজী ভাষা ব্যবহার করেন। অতএব ভাষার গুরুত্ব বা ভারতের অবস্থার দিক দিয়া বিচার করিলে ভারতে ইংরাজী ভাষার প্রসার হওয়াই উচিত।

"অনেকে বলেন যে, দেশের অধিবাসীদের সহযোগিতা লাভ করিতে হইলে, সংস্কৃত ও আরবী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। মেকলে বলেন,'আমি একথা স্বীকার করিতে রাজী নহি যে যখন একটি উন্নত জাতি একটি অনগ্রসর জাতির শিক্ষার ভার নেয়, তখন অনগ্রসর জাতির পছন্দ-অপছন্দের উপর শিক্ষার বিষয় নির্ধারিত হইবে।'

"যাহা উপকারী এবং প্রীতিকর তাহা করিতে লোককে টাকা দিতে হয়, ইহা পৃথিবীর কোথাও দেখা যায় না। ভারতবর্ষেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারে না। গ্রামে শিশুরা গ্রাম্য শিক্ষকের নিকট যে বর্ণ-পরিচয় ও গণিত শিক্ষা করে, তাহার জন্য তাহাদের কোন টাকা দেওয়া হয় না; বরং শিক্ষকই টাকা পান। অতএব সংস্কৃত ও আরবী শিখিবার জন্য কেন-ই বা টাকা দিতে হইবে? ইহার কারণ এই সংস্কৃত ও আরবী এমনই ভাষা যে, ইহা শিখিতে যে কষ্ট হইবে তাহার মজুরি পোষায় না।

"আরবী ও সংস্কৃত কলেজের জন্য আমরা যে টাকা খরচ করিতেছি, ইহা যে ভাল বিষয়ে খরচ হইতেছে না তাহাই নহে; ইহা দ্বারা আমরা অন্যায়েরই প্রশ্রয় দিতেছি।

"কমিটি আরবী ও সংস্কৃত পুস্তক ছাপাইবার জন্য এক লক্ষ টাকা খরচ করিয়াছেন। কিন্তু এই বই কিনিবার লোক কোথায়? কদাচিৎ কখনও একখানি বই বিক্রয় হয়। সমিতির পাঠাগারে ২০,০০০ বই জমা হইয়া রহিয়াছে। মাঝে মাঝে বিনা পয়সায় বিলাইয়া সমিতি বই-এর ভাণ্ডার কিছু কমান। বছরে বছরে ২০,০০০ টাকা খরচ করিয়া বাজে কাগজের বোঝাই বাড়ানো হয়। অপরপক্ষে School Book Society বছরে ৭।৮ হাজার ইংরাজী বই বিক্রয় করিয়া শুধু সে ছাপার খরচ তুলে তাহা নহে, শতকরা ২০ টাকা পর্যন্ত লাভও করে।

"হিন্দু আইন সংস্কৃত পুস্তক হইতে এবং মুসলমান আইন আরবী

ভাষায় লিখিত গ্রন্থ হইতে জানা যায় বলিয়াই কি এই দুইটি ভাষা শিখিতে হইবে? ব্রিটিশ পার্লামেন্ট নির্দেশ দিয়াছেন যে, ভারতের আইন সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। এই বিষয়ে Law Commission-এর সাহায্য লওয়া হইয়াছে। আইন লিপিবদ্ধ হইলেই মুন্‌সেফেরা সংস্কৃত ও আরবী ভাষা না জানিয়াও আইনজ্ঞ হইতে পারিবেন। অতএব সংস্কৃত ও আরবী ভাষা শিক্ষার জন্য পণ্ডশ্রম করিয়া লাভ কি হইবে?

"অনেকে বলেন যে, হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ সংস্কৃত ও আরবী ভাষায় লিখিত। অতএব ভারতবাসীদের এই দুইটি ভাষা শেখা উচিত। ইহা সত্য যে, ধর্মবিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের নিরপেক্ষ থাকা উচিত। ভারতের ধর্মশাস্ত্র কুসংস্কারে পূর্ণ। কুসংস্কারপূর্ণ ধর্মশাস্ত্র পড়িবার সুযোগ হইবে বলিয়াই কি সাহিত্য হিসাবে অনুন্নত একটা ভাষা শিখাইতে হইবে? এই দেশের লোকদের যাঁহারা খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা করেন, সরকার তাঁহাদের সাহায্য করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন না। এই রকম অবস্থায়, যে ধর্মশাস্ত্রে বলে যে, গাধাকে ছুঁইলে মানুষ পবিত্র হয় বা গো-হত্যা করার ফলে পাপমুক্ত হইবার জন্য বেদের কয়েকটি মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, সেই ধর্মশাস্ত্র পাঠ করিবার যোগ্যতা লাভ করিবার জন্য সংস্কৃত ভাষা শিখাইতে কি অর্থ ব্যয় করিতে হইবে?

"কেহ কেহ বলেন যে, ভারতীয়েরা ভালভাবে ইংরাজী শিখিতে পারিবে না, ছিটে-ফোঁটা শিখিবে মাত্র। ইহারা বলিতে চান যে, ছিটে-ফোঁটা ইংরাজী শিক্ষা করা অপেক্ষা ভালভাবে সংস্কৃত বা আরবী ভাষা শিক্ষা করা ভাল। ইহারা ধরিয়া লন যে, ভারতবাসীদের পক্ষে ভালভাবে ইংরাজী শিক্ষা করা সম্ভব নহে। যদি ইংরাজ যুবকদের পক্ষে Greek ও Latin ভাষা শিক্ষা করা কঠিন না হয়, তাহা হইলে ভারতীয়দের পক্ষে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করাই বা কঠিন হইবে কেন?

মেকলে বলেন, "সংক্ষেপে আমার বক্তব্য হইতেছে যে, পার্লামেণ্টের ১৮১৩ সালের আইন বা কোন রকম পূর্ব-প্রতিশ্রুতি আমাদের কোন রূপ বাধার সৃষ্টি করে নাই। টাকা আমরা যে-কোন ভাবে খরচ করিতে পারি। যাহা জানা দরকার তেমন কিছু শিখাইবার জন্যই টাকা খরচ করা উচিত। সংস্কৃত ও আরবী ভাষা অপেক্ষা ইংরাজী শিক্ষাই বেশী উপযোগী। দেশের লোকেরা সংস্কৃত ও আরবী অপেক্ষা ইংরাজী শিখিবার জন্যই বেশী উৎসাহী। আইন বা ধর্মের ভাষা হিসাবেও সংস্কৃত ও আরবী ভাষা শিক্ষার জন্য অর্থ সাহায্য করার কোন প্রয়োজন নাই। এই দেশের লোকদের ভালভাবে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া সম্ভব এবং এই বিষয়ে আমাদের চেষ্টা করা উচিত।

মেকলে আরও বলেন, "আমি বিশ্বাস করি যে, আমাদের পক্ষে দেশের অধিকাংশ লোককে এখন শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নহে। বর্তমানে আমাদের চেষ্টা করিতে হইবে এমন এক শ্রেণীর লোক তৈয়ারি করিতে, যাহারা দেশের লক্ষ লক্ষ লোক এবং আমাদের মধ্যে দো-ভাষীর কাজ করিবে। এমন এক শ্রেণীর লোক সৃষ্টি করিতে হইবে যাহারা গায়ের রং ও রক্তে হইবে ভারতবাসী, কিন্তু রুচি, মতামত, নীতি, বুদ্ধি ও অন্য বিষয়ে হইবে ইংরাজদের মতো; এই শ্রেণীই দেশীয় ভাষার উন্নতি সাধন করিবে।

"বর্তমানে চালু সমস্ত সংস্থার স্বার্থ আমি রক্ষা করিব। যে সমস্ত ব্যক্তি সরকারের নিকট অর্থসাহায্য পাইবার উপযুক্ত, আমি তাহাদের কোন ক্ষতি করিতে চাই না। কিন্তু এ পর্যন্ত যে খারাপ ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছিল, আমি তাহার মূল উৎপাটন করিব। আমি সংস্কৃত ও আরবী পুস্তক ছাপা বন্ধ করিব; কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ ও মাদ্রাসা উঠাইয়া দিব। বারাণসী ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার এবং দিল্লী আরবী শিক্ষার কেন্দ্র। যদি আমরা বারাণসীর সংস্কৃত কলেজ ও দিল্লীর আরবী কলেজ

রাখিয়া দিই, তাহা হইলে এদেশীয় ভাষার জন্য যথেষ্ট করা হইল বলা যাইতে পারে। যদি দিল্লী ও বারাণসীর কলেজ রাখা হয়, তাহা হইলে আমি সুপারিশ করিব যে, সেখানে যে ছেলেরা পড়িবে তাহাদের কোন অর্থসাহায্য দেওয়া হইবে নাই। এক দিকে ইংরাজী এবং অন্য দিকে সংস্কৃত ও আরবী শিক্ষার মধ্যে যে-কোন একটি দেশীয় লোকেরা স্বেচ্ছায় শিক্ষা করিতে পারিবে। কিন্তু ইহার জন্য অর্থসাহায্যরূপ ঘুষ দেওয়া হইবে না।

"আমাদের হাতে যে টাকা দেওয়া হইবে, তাহা দ্বারা আমরা কলিকাতার হিন্দু কলেজকে অধিকতর সাহায্য করিতে পারিব এবং অন্যান্য প্রেসিডেন্সী শহর ও আগ্রায় নূতন বিদ্যালয় স্থাপন করিতে পারিব যেখানে ইংরাজী ভালভাবে শিক্ষা দেওয়া হইবে।

"যদি সপরিষদ্ গভর্নর আমার মত গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমি যথাশক্তি আমার কর্তব্য সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিব। অপরপক্ষে, সরকার যদি মনে করেন যে, বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু থাকিবে তাহা হইলে আমাকে আমার কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিতে অনুমতি দেওয়া হউক; কারণ আমার মনে হয়, আমি এই সমিতিতে কোন কাজই করিতে পারিব না এবং আমি যাহা ভ্রান্ত বলিয়া মনে করি তাহাকেই সমর্থন করা হইবে। আমি মনে করি যে, বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা সত্যের অগ্রগতি ব্যাহত করিবার এবং মিথ্যার অপসারণ বিলম্বিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। আমার মনে হয়, বর্তমানে আমাদের 'সাধারণ শিক্ষা-পর্ষৎ' (Board of Public Instruction) এই নাম ব্যবহার করিবার কোন সার্থকতা নাই। আমাদিগকে অর্থ অপচয় করিবার পর্ষৎ বলা যাইতে পারে। আমরা যে পুস্তক ছাপাইবার জন্য অর্থ ব্যয়, করিতেছি, সেই পুস্তকের মূল্য কাণা-কড়িও নহে।"

(২) ১৮৫৪ সালের নির্দেশ

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করিয়া ইংরাজেরা এদেশে রাজত্বের পত্তন করিলেন—"বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে।" ইংরাজেরা প্রথমে এদেশে আসিয়াছিলেন বাণিজ্য করিতে ; কাজেই অর্থের দিকেই তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল অধিক। ফলে ভারতে ইংরাজ-শাসন প্রবর্তিত হওয়ার প্রায় ১০০ বৎসর পরে ১৮৫৪ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি (East India Company) শিক্ষা সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট নীতি ঘোষণা করিলেন। ১৮৫৪ সালের নির্দেশনামাকে ভারতে শিক্ষা-বিস্তারের ইতিহাসে Magna Charta বলা যাইতে পারে। এই নির্দেশ অনুসারে কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রেসিডেন্সী শহরে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া শিক্ষা-অধিকর্তার পদ সৃষ্টি করা হয়। এই নির্দেশনামাতে শিক্ষা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য-গুলি দেশবাসীর সম্মুখে স্থাপন করা হয় :—

(১) শিক্ষা পরিচালনা করিবার জন্য একটি পৃথক শিক্ষা-বিভাগ স্থাপন করা। (২) প্রেসিডেন্সী শহরে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন। (৩) চলতি সরকারী বিদ্যালয় ও কলেজকে সাহায্য দান করা এবং প্রয়োজনবোধে বিদ্যালয় ও কলেজের সংখ্যা বাড়ানো (৪) সকল শ্রেণীর শিক্ষকদের শিক্ষা-লাভের (Training) জন্য শিক্ষা-কেন্দ্র স্থাপন করা। (৫) নূতন মধ্য বিদ্যালয় স্থাপন করা। (৬) প্রাথমিক শিক্ষাদান কার্যে নিযুক্ত দেশীয় বিদ্যালয়গুলির উপর অধিক মনোযোগ দেওয়া। (৭) সাহায্যদান-প্রথা প্রবর্তন করা। ইহা ছাড়া, এই নির্দেশনামাতে আরো বলা হইয়াছে যে, জনসাধারণ যাহাতে প্রয়োজনীয় ও কার্যকরী শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ পায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

জনসাধারণের তাগিদ থাকিলে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইবে, কিন্তু দেশীয় ভাষার পরিবর্তে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইবে না।

ধর্মনিরপেক্ষভাবে বিদ্যালয়ে সাহায্য দান করা হইবে। যে সমস্ত বিদ্যালয়ে সাধারণ ধর্মনিরপেক্ষ বিষয় পড়ানো হয়, যেখানে ছেলেদের নিকট বেতন লওয়া হয়, যেখানে সরকারী পরিদর্শকদের পরিদর্শনে কোন বাধা নাই এবং যাহা স্থানীয় সমিতি কর্তৃক পরিচালিত হয়, সেই

সকল বিদ্যালয়ই সাহায্য পাইবে। যে সকল স্থানে বে-সরকারী বিদ্যালয় সরকারের সাহায্য লইয়া স্থানীয় লোকেদের শিক্ষার সুযোগ দিতেছে, সেখানে নূতন করিয়া সরকারী বিদ্যালয় ও কলেজ খোলা হইবে না।

প্রাথমিক স্তর হইতে কলেজীয় স্তরের শিক্ষার মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপন করিবার জন্য ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়া হইবে।

স্ত্রী-শিক্ষার জন্য সরকার যথাযথ সাহায্য দিতে প্রস্তুত আছেন।

সরকারী চাকুরি দিবার সময় যাঁহারা ভাল শিক্ষা পাইয়াছেন তাঁহাদেরই সুযোগ দেওয়া হইবে।

১৮৫৪ সালের নির্দেশনামাকেই ভারতীয় শিক্ষা-বিষয়ক সর্বপ্রথম নিয়মপত্রিকা (Code) বলা যায়। এই সর্বপ্রথম সরকার স্বীকার করিলেন :—

"প্রয়োজনীয় ও কার্যকরী জ্ঞান কেমন করিয়া সকল শ্রেণীর লোককে দেওয়া যায়, এই বিষয় এতদিন গ্রাহ্য করা হয় নাই। সরকার বুঝিয়াছেন যে, এই দেশের লোক সরকারী সাহায্য ছাড়া এই প্রকার প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিবে না। সরকার এখন হইতে শিক্ষা-বিস্তারের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখিবেন এবং অধিক পরিমাণে অর্থ ব্যয় করিবেন।

১৮৩৫ সালের মেকলের নির্দেশনামা ও ১৮৫৪ সালের নির্দেশনামা দ্বারা সরকারের শিক্ষানীতি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ইহার পূর্ব হইতেই বাংলা দেশে মাধ্যমিক শিক্ষা-প্রসারের কার্য শুরু হইয়া গিয়াছিল। ১৮১৪ সালে খ্রীষ্টান ধর্মযাজক মে সাহেব চুঁচুড়াতে একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়টি সাময়িক সরকারী সাহায্যও পায়। তাহার পরে শরবোরন সাহেব কলিকাতায় একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮১৭ সালের ২০শে জানুয়ারি হেয়ার সাহেবের চেষ্টায় কলিকাতায় একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং এই বিদ্যালয়ই পরে হিন্দু কলেজে উন্নীত হয়। ইহার পর হইতে ইংরাজী শিক্ষার প্রতি দেশের লোকের আগ্রহ জন্মাইবার সঙ্গে এবং সরকারী সাহায্যে ও উৎসাহে দেশের নানা স্থানে মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে থাকে।